ধর্ম্মবিজ্ঞান।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

বিজ্ঞান।

আজি কালি বিজ্ঞানের মৌখিক সমাদর বড় বাড়িয়াছে। যিনি বিজ্ঞানের 'ব' জানেন না, তিনিও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কথা শুনিতে চাহেন না। আধুনিক শিক্ষিত আবালবৃদ্ধ-বনিতা সকলেই বিজ্ঞান-বিরুদ্ধ বলিয়া সনাতন পৈতৃক ধর্ম্ম, পিতা মাতা প্রভৃতি গুরুজনের সেবা, এবং চিরাচরিত অতি কল্যাণকর রীতি নীতি সকল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। বাস্তবিক তৎসমস্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ কি না, তাহা কেহ বুঝেন না, অধিক কি বিজ্ঞান কাহাকে বলে, তাহাই অনেকে জ ন না। পাশ্চাত্য সভ্যতার কৃত্রিম চাক্‌চিক্যে চক্ষুরোগগ্রস্ত হইয়া সকলেই অন্ধের ন্যায় মিথ্যা দর্শন করেন। সেই জন্য সর্ব্ব প্রথমে বিজ্ঞানের লক্ষণ নির্ণয়ের চেষ্টা করা আবশ্যক।

প্রথমে শব্দবিদ্যার আশ্রয় লইয়া বিজ্ঞান শব্দের প্রকৃতি ও মৌলিক অর্থ নিরূপণ করা যাইতেছে। বি + জ্ঞা + অন=বিজ্ঞান। অর্থাৎ বি পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতু অনট্ প্রত্যয় দ্বারা বিজ্ঞান শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। জ্ঞা ধাতু বিজ্ঞান শব্দের মূল। জ্ঞা ধাতুর অর্থ জানা, সুতরাং বিজ্ঞান শব্দের অর্থ বিশিষ্ট রূপে জানা; যে শাস্ত্র পাঠে বিশিষ্টরূপ জ্ঞান লাভ হয়, তাহাকে বিজ্ঞানশাস্ত্র কহে। পাশ্চাত্য শব্দবিদ্যা অনুসারেও বিজ্ঞানের (Scince) ঐরূপ অর্থ হয়, যথা—L. *Scientia,*—knowledge; from *Scio, I know.* It. *Scienzia*, Fr. *Science.* সুতরাং উহারও মূল Knowledge বা জ্ঞান এবং উহার আভিধানিক অর্থ **Profound or complete knowledge.**

জ্ঞান বা 'জানা' আমাদের সর্ব্ব প্রধান আবশ্যক। কেননা জানিতে না পারিলে আমরা কিছুই করিতে পারি না। যদি জানিতে না পারি কি উপায়ে ক্ষুধা নিবারণ হয়, কি উপায়ে জীবন রক্ষার উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করিতে হয়, তবে কি প্রকারে আমরা ক্ষুধা নিবারণ করিব? কি প্রকারে প্রাণরক্ষা হইবে? যদি জানিতে না পারি, কি উপায়ে পীড়া নিবারণ করিতে হয়, কিরূপে রোগ ও ঔষধ নির্ণয় করিতে হয়, তবে কি প্রকারে প্রাণরক্ষা হইবে? এইরূপ অনেক বিষয় আমাদের জানা আবশ্যক। যে সকল বিষয়ের সহিত আমাদের কোন প্রকার সংস্রব আছে, তৎ সমস্তেরই জ্ঞান লাভ আবশ্যক। আমরা কি, কোথা হইতে আসিয়াছি, কোথায় যাইব, কি জন্য আসিয়াছি, কে আনিয়াছে, আমাদের কার্য্য কি, উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য কি; সুখ-দুঃখ কাহাকে বলে, কি প্রকারে দুঃখ নিবারণ ও সুখ লাভ হইতে পারে; বিশ্ব কি, তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক আছে কি না, যদি থাকে তবে সে কি প্রকার; ইতরপ্রাণী ও মানবের সহিত আমাদের কিরূপ ব্যবহার কর্ত্তব্য; হিতাহিত কাহাকে বলে, কি প্রকারে হিতাহিত সাধিত হয়, স্বার্থপরতা হিতকর না পরার্থপরতা হিতকর; পরকাল আছে কি না, যদি থাকে তবে ইহকালের মঙ্গলামঙ্গলের সহিত তাহার কোন রূপ সম্বন্ধ আছে কি না এবং কোন্ কাল আমাদের প্রধান লক্ষ্যের বিষয়; বিশ্ব ভিন্ন আর কিছু আছে কি না, যদি থাকে তবে সে কি, তাহার সহিত আমাদের সম্পর্ক কি, সেই বিশ্বাতিরিক্ত বা বিশ্বময় পদার্থের (ঈশ্বরের?) স্বরূপ ও প্রকৃতি কিরূপ ইত্যাদি অনেক বিষয় আমাদের জ্ঞাতব্য। তৎসমস্ত জানিতে না পারিলে আমাদের প্রয়োজনীয় সকল সম্পন্ন হয় না, সুতরাং প্রকৃত সুখলাভ হয় না। এই জন্য বিজ্ঞানশাস্ত্র মানবের অতি প্রয়োজনীয়। উহার অধিকারও অতিশয় বিস্তীর্ণ। কেবলমাত্র পদার্থবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ প্রভৃতি উহার অধিকার ভুক্ত নহে। ঈশ্বরতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব প্রভৃতি সমস্তই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। সমগ্র বিশ্ব আমাদের জ্ঞাতব্য, সুতরাং বিশ্বব্যাপিয়া উহার অধিকার।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন যে, যে যদ্দারা জ্ঞান লাভ হয় তৎসমস্তই যদি বিজ্ঞানবাচ্য হয়, তবে ত জগতে বিজ্ঞান ভিন্ন আর কিছুই থাকে না—তাহা হইলে পৃথিবীতে যত গ্রন্থ আছে সমস্তকেই বিজ্ঞান বলিতে

হয়—বেদ, কোরাণ, বাইবেল; পুরাণ, ইতিহাস, তন্ত্র;—কাব্য, উপন্যাস, নাটক সমস্তকেই বিজ্ঞান বলিতে হয়। কেন না, সকল পুস্তক হইতেই কিছু না কিছু জ্ঞানলাভ হয়। কিঞ্চিন্মাত্র জ্ঞানলাভ হয় না, এমত পুস্তকই বিদ্যমান নাই।

কিন্তু একটী বিষয় বিবেচনা করিতে হইবে। জানিয়াছি বলিয়া সংস্কার হইলেই জানা হয় না, প্রকৃত জ্ঞান হওয়া চাই—সত্য জানা চাই; (ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির সহিত বাহ্য বা অন্তরস্থ পদার্থান্তরের সংযোগজনিত ভাবকে জ্ঞান বলে।) অনেক সময়ে ইন্দ্রিয়াদির সহিত বিষয়ের সংযোগ না হইয়াও বোধ হয় যেন সংযোগ হইয়াছে। সেরূপ সময়ে যাহা জানা হয় তাহাকে জ্ঞান বা জানা বলা যাইতে পারে না। তুমি এক গাছি রর্জ্জু দেখিলে, কিন্তু উহা তোমার চক্ষে সর্প বলিয়া বোধ হইল। কেন হইল? সর্পের সহিত রজ্জুর কিয়ৎপরিমাণ সাদৃশ্য আছে। যে অংশে সর্পের সহিত রজ্জুর সাদৃশ্য আছে, সেই অংশটুকু মাত্র তোমার ইন্দ্রিয়গোচর হইয়াছিল, সমগ্র রজ্জু ইন্দ্রিয়ের গোচর হয় নাই, সেই জন্য রজ্জুকে তোমার সর্পজ্ঞান হইয়াছিল। এরূপ জ্ঞানকে জ্ঞান বলা যায় না, প্রত্যুত উহাকে ভ্রান্তিই বলিতে হয়। যদি কেহ ঐরূপে সর্প দেখিয়া আসিয়া কহে আমি সর্প দেখিয়াছি, তবে সে সত্য কথা বলে নাই। সত্য বটে সে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা বলে নাই, যেমন জানিয়াছে, সেইরূপই বলিয়াছে, কিন্তু যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য নহে, সম্পূর্ণ মিথ্যা। সুতরাং তাহার বিশ্বাসানুযায়ী সেই সত্য কথা হইতে তোমার যে জ্ঞান জন্মিল, তাহা প্রকৃত নহে। অতএব জানা হইল বলিয়া সংস্কার হইলেই জানা হয় না, যাহা যাহা তাহাই সত্য এবং যাহা যাহা তাহাকে তাহা বলিয়া জানাকে সত্যজ্ঞান বলে। (যাহা সত্য নির্ণায়ক অর্থাৎ যদ্দ্বারা যে বিষয় যাহা সেই বিষয়কে তাহা বলিয়া জানা যায়, তাহাই বিজ্ঞানপদবাচ্য।) বাইবেলাদি গ্রন্থ যদি ঐরূপ সত্যনির্ণায়ক হয়, তবে অবশ্যই উহা বিজ্ঞান। বাইবেল যে বলিতেছে, খ্রীষ্ট উপাসনা ব্যতিরেকে মানবের উদ্ধারের উপায় নাই, একথা যদি সত্য হয় তবে অবশ্য উহা বিজ্ঞান-বাক্য।

এক্ষণে কথা এই যে, কোন্‌টি সত্য, কোন্‌টি সত্য নয়, তাহা জানিব কি প্রকারে? ওখানে যাহা দেখিলাম, তাহা সর্প না রজ্জু? আমি ত

দেখিয়াছি সর্প, কিন্তু তুমি বলিতেছ রজ্জু। তুমিও আপন চক্ষে দেখিয়াছ, আমিও আপন চক্ষে দেখিয়াছি; কি প্রকারে জানিব, আমার কথা সত্য, কি তোমার কথা সত্য? সর্পকে সর্প ও রজ্জুকে রজ্জু বলিয়া জানিবার উপায় কি? অবশ্য বলিতে হইবে অবিকৃত চক্ষু ও মন, আবশ্যক মত আলোক ও দর্শনীয় পদার্থের সন্নিকর্ষ প্রভৃতি দর্শনজ্ঞান জন্মিবার কারণাবলীর সংযোগই প্রকৃত দর্শনজ্ঞানের নিদান। ঐ সকল কারণের সংযোগ হইলেই যে বস্তু যাহা, সেই বস্তু তদাকারে চক্ষে পতিত হয়, তাহার কিঞ্চিৎ ব্যতিক্রম হইলে, প্রকৃত দর্শনজ্ঞান জন্মে না। আমি যে সর্প দেখিয়াছি, তাহা কি ঐ প্রকারে দেখিয়াছি? যদি সেরূপে না দেখিয়া থাকি, যদি কোনও অঙ্গের বৈলক্ষণ্য হইয়া থাকে, তবে কখনই প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় নাই, বরং তদ্বিপরীত ভ্রান্তিই হইয়াছে। অতএব যে প্রকারে দেখিলে স্বরূপ দৃষ্টি হয় সেইরূপে পুনরায় দেখিলে অবশ্যই বুঝিতে পারিব ঐ সর্পদর্শন সত্য কি না? ঐ রূপে বাইবেল যাহা বলিয়াছে তাহা সত্য কি না বুঝিতে হইলে যে উপায় অবলম্বন করিলে ঐরূপ সত্য প্রতিভাত হইতে পারে, সেই উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক। কিন্তু এরূপ স্থলে দর্শনোপযোগী উপায় অবলম্বন করিলে হইবে না, শ্রবণোপযোগী উপায় অবলম্বন করিলেও চলিবে না। এরূপ স্থলে যে উপায় অবলম্বিত হয় তাহার প্রচলিত নাম যুক্তি। তাই যুক্তি-বিরুদ্ধ কথা বিজ্ঞানবাচ্য নহে। 'যাহা যুক্তিসঙ্গত Reasonable তাহাকে বিজ্ঞান' বলে। এই জন্য সত্য স্থির করিতে হইলে যুক্তি অবলম্বন করিতে হয়।

কিন্তু যুক্তি কাহাকে বলে? অনেকে সম্ভব অসম্ভব লইয়া যুক্তি শব্দের ব্যবহার করেন। অর্থাৎ যাহা সম্ভব তাহা যুক্তিসিদ্ধ ও যাহা অসম্ভব তাহা যুক্তিবিরুদ্ধ। কিন্তু সম্ভব অসম্ভবের লক্ষণ কৈ? আজি যাহা সম্পূর্ণ সম্ভব, শতবর্ষ পূর্ব্বে তাহা একান্ত অসম্ভব ছিল; শতবর্ষ পূর্ব্বে যাহা সম্ভব ছিল এক্ষণে তাহা একান্ত অসম্ভব। শতবর্ষ পূর্ব্বে যদি কেহ বলিত শত যোজন পথ এক দিনে যাওয়া যায়, ছয় মাসের পথের সংবাদ এক মুহূর্ত্তে লওয়া যায়, শত যোড়া বস্ত্র এক দিনে বুনা যায়, অযুত পুস্তক এক দিনে লেখা যায়, তাহা হইলে কি কেহ সম্ভব মনে করিত? না, প্রাচীন কালের লোকেরা যে সকল আশ্চর্য্য বলবীর্য্য প্রকাশ ও সুমহৎ

কার্য্য সম্পাদন করিতেন, এক্ষণকার লোকেরা তাহা সম্ভব মনে করে? বাস্তবিক সম্ভব অসম্ভবের কোন সীমানির্দ্দেশ করা কঠিন। কাজেই সম্ভব অসম্ভবের উপর যুক্তি দাঁড়াইতে পারে না। অনেকে কোন একটী মূল বিষয় সত্য বলিয়া মনে করিয়া লইয়া, তাহার উপর যুক্তি স্থাপনা করেন। যেমন অনেকে বলেন, যখন ঈশ্বর সকল মনুষ্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, তখন অবশ্য তিনি সকল মনুষ্যকে সমান করিয়াছেন, নচেৎ তাঁহাকে পক্ষপাতী বলিতে হয়। এই মূল ধরিয়া তাঁহারা বলেন সকল মনুষ্যকে সমান স্বত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু তাঁহাদের এই মূলবাক্যের সত্যতার কিছুমাত্র প্রমাণ নাই। সৃষ্ট-বস্তুমাত্রকেই যে ঈশ্বরকে সমান করিতে হইবে, না করিলে তাঁহার পক্ষপাত করা হইবে এ কথার কোন প্রমাণও নাই, কোন অর্থও নাই। কেহ বলেন উন্নতিকর কার্য্যই মানবের একান্ত কর্ত্তব্য, কেন না, উন্নতিই জগতের লক্ষ্য। কিন্তু উন্নতি যে জগতের লক্ষ্য তাহার প্রমাণ কি? বরং দেখা যাইতেছে জন্মের সহিত যেমন মৃত্যুর চিরসম্বন্ধ, উন্নতির সহিত সেইরূপ অবনতির চিরসম্বন্ধ রহিয়াছে। অনেক পণ্ডিতের স্থির সিদ্ধান্ত পরমাণু নামক সূক্ষ্মতম পদার্থ সমস্ত পদার্থেরই মূল উপাদান। কিন্তু বাস্তবিক পরমাণু সমূহ বৃহৎ পদার্থের মূল, কি বৃহৎ পদার্থ পরমাণুসকলের মূল? বৃক্ষ বীজের কারণ, কি বীজ বৃক্ষের কারণ, তাহা কে বলিতে পারে? এইরূপ অনেক যুক্তিই, সংস্কার, বিশ্বাস বা কল্পিত অনুমান বিশেষের উপর স্থাপিত। সুতরাং সে সকলকে সত্য বলা যাইতে পারে না। যাহা শারীর বৃত্তিবিশেষ দ্বারা উপলব্ধ নহে অর্থাৎ যে জ্ঞান প্রত্যক্ষলব্ধ নহে তাহা সত্য নহে। প্রত্যক্ষের উপর স্থাপিত যুক্তিই প্রকৃত যুক্তি।

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা প্রভৃতি ইন্দ্রিয়দ্বারা যাহা অবগত হওয়া যায়, তাহাকেই সাধারণতঃ প্রত্যক্ষ বলে। কিন্তু দেখা যাইতেছে সকল সময়ে ঐরূপ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সত্য হয় না। রজ্জুকে যখন সর্প দেখি, তখন ঐ প্রত্যক্ষ-জ্ঞান সত্য নহে। ঐরূপ আকাশস্থ চন্দ্র, সূর্য্য, তারাগণকে যেরূপ ক্ষুদ্র ও উজ্জ্বল দেখি তাহাও সত্য নয়। ইন্দ্রিয়ের বিষয় হইলেই প্রত্যক্ষ হয় না। প্রত্যক্ষজ্ঞান লাভ করিবার জন্য ইন্দ্রিয় ব্যতীত আরও অনেক প্রকার শারীরিক ও মানসিক শক্তির সহায়তা আবশ্যক। আবার সকল বিষয় সকলের ইন্দ্রিয়-

গোচর হইতে পারে না; যদি আপন প্রত্যক্ষ ভিন্ন জ্ঞান লাভের আর কোন উপায় নাই বলা যায়, তবে নিজে যাহা প্রত্যক্ষ করিতে না পারিলাম তাহার জ্ঞান লাভ করিবার উপায় কি? যে কালে ও যে প্রদেশে আমি উপস্থিত থাকি না, সে কালের ও সে দেশের জ্ঞাতব্য বিষয় জানিবার উপায় কি? আমি কতটুকু কাল ও কতটুকু স্থান অবলম্বন করিয়া বর্ত্তমান থাকি? আমি কত বিষয় স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিতে পারি? জ্ঞাতব্য সমস্ত বিষয়ের সহিত তুলনা করিয়া বলিতে হইলে, আপন প্রত্যক্ষলব্ধজ্ঞানকে অণুপ্রমাণও বলা যায় না। সুতরাং পরের প্রত্যক্ষকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়, নচেৎ আমাদের কিছুই জানা হন না। এই জন্য আর্য্য-দার্শনিকেরা পর প্রত্যক্ষকে শাব্দ প্রমাণ নামে অভিহিত করিয়া জ্ঞানের-কারণমধ্যে ধরিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ আত্মপ্রত্যক্ষে ও পরপ্রত্যক্ষে কিছু মাত্র ভেদ নাই। যাহা আপনার প্রত্যক্ষ তাহাই পরের প্রত্যক্ষ, এবং যাহা পরের প্রত্যক্ষ তাহাই আপনার প্রত্যক্ষ। যাহা আমার সম্বন্ধে আত্মপ্রত্যক্ষ, তাহা আর সকলেরই সম্বন্ধে পরপ্রত্যক্ষ, যাহা আমার সম্বন্ধে পরপ্রত্যক্ষ, তাহা কাহারও না কাহারও আত্মপ্রত্যক্ষ। সুতরাং আত্মপ্রত্যক্ষকে সত্য বলিলে পরপ্রত্যক্ষকে সত্য বলিতে হয়, এবং পরপ্রত্যক্ষকে মিথ্যা বলিলে আত্মপ্রত্যক্ষকেও মিথ্যা বলিতে হয়। অতএব পরপ্রত্যক্ষকেও জ্ঞানের কারণ বলিতে হয়। যদি বল অনেক স্বার্থপর ব্যক্তি স্বার্থসাধনাভিলাষে যাহা কখনও প্রত্যক্ষগোচর হয় নাই, তাহাকে প্রত্যক্ষলব্ধ বলেন, এই জন্য পরপ্রত্যক্ষ সমস্ত বাস্তবিক প্রত্যক্ষ নহে, সুতরাং পরপ্রত্যক্ষ জ্ঞানের কারণ হইলে অনেক ভ্রান্তি জন্মিতে পারে, এজন্য উহাকে জ্ঞানের কারণ মধ্যে ধরা উচিত নহে, কিন্তু তাহা হইলে আপনার প্রত্যক্ষকেও জ্ঞানেকর কারণ বলিতে পারা যায় না। কেননা, তাহাতেও অনেক প্রমাদ আছে। আমিও ত রজ্জু দেখিয়া সর্প জ্ঞান করিয়া থাকি; উহা ত বাস্তবিক প্রত্যক্ষ নহে। বিশেষতঃ মূর্খ ও শক্তি-হীনগণের আত্ম-প্রত্যক্ষলব্ধ জ্ঞান প্রায়ই মিথ্যা হয়। ফলতঃ আপনার ও পরের প্রত্যক্ষ উভয়তেই সত্য আছে, উভয়তেই প্রমাদ আছে। কখনও আপনার প্রত্যক্ষ সত্য ও পরের প্রত্যক্ষ মিথ্যা হয় ও কখনও পরের প্রত্যক্ষ সত্য ও আপনার প্রত্যক্ষ মিথ্যা হয়। এই নিমিত্ত আত্মপ্রত্যক্ষকে সত্য করিবার জন্য যেমন নানা প্রকার প্রক্রিয়ার সাহায্য আবশ্যক, পরপ্রত্যক্ষ ব্যব-

হার করিবার সময়েও সেইরূপ নানা প্রকার সংস্কার ক্রিয়া প্রয়োগ করা উচিত।

ইন্দ্রিয়ের সহায়তা ভিন্ন কোন প্রকার জ্ঞান লাভ হইতে পারে না বটে; কিন্তু সকল সময়েই ইন্দ্রিয়ের বর্ত্তমানতার আবশ্যক হয় না এবং কেবল মাত্র ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় জ্ঞান লাভ হয় না। সত্য জ্ঞান লাভ করিতে হইলে বহুতর মনোবৃত্তির সহায়তা লওয়া আবশ্যক। মনে কর, পূর্ব্বে তুমি একদিন হস্তী দেখিয়া তাহার আকৃতি আদি হৃদয়ঙ্গম করিয়া রাখিয়াছিলে। এক দিন তুমি বসিয়া আছ, এমন সময়ে সেই হস্তীর আকার তোমার নয়নপথে উপস্থিত হইল। বাস্তবিক কোন হস্তী তখন তোমার সম্মুখে না থাকিলেও তুমি কি প্রকারে হস্তী দেখিলে? এখানে তোমার দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত হস্তীর সংযোগ না হইলেও কি প্রকারে হস্তী দর্শন হইল? এরূপ স্থলে মনোবৃত্তিই দর্শন জ্ঞান উৎপাদনের হেতু। কেননা পূর্ব্বে যখন তুমি হস্তী দর্শন করিয়া ছিলে, তখন সেই হস্তিচিত্র তোমার হৃদয়ে অঙ্কিত হইয়াছিল, ধারণা তাহাকে ধারণ করিয়া রাখিয়াছিল এক্ষণে স্মৃতি, সেই চিত্রপট তোমার চক্ষুসমীপে আনিয়া দিল। এই অবস্থায় তোমার যে হস্তিজ্ঞান হইল তাহার বর্ত্তমান কারণ ইন্দ্রিয় না হইলেও ইন্দ্রিয় উহার মূল কারণ। কেননা, যদি তুমি কখনও হস্তী না দেখিতে, তাহা হইলে ধারণাদি তোমাকে উহা দেখাইতে পারিত না। আবার, যদি ধারণাদি আবশ্যক মনোবৃত্তি গুলি ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষ কালে কার্য্য না করিত, তাহা হইলে তোমার হস্তি দর্শনই হইত না, হইলেও পুনরায় হস্তী দেখিয়া চিনিতে পারিতে না। বাস্তবিক আন্তরিক বুদ্ধিবৃত্তির সহায়তা ভিন্ন কোন জ্ঞানই লব্ধ ও স্থায়ী হইতে পারে না। অতএব মনোবৃত্তিসকল নিয়ত প্রত্যক্ষের সহচর ও প্রত্যক্ষ-জ্ঞানের সমবায় কারণ। তুমি পর্ব্বতে ধূম দৃষ্টি করিলে। পূর্ব্বে জানিয়াছ অগ্নিই ধূমের কারণ, কখনও অগ্নি ভিন্ন ধূম দেখ নাই, এইজন্য এক্ষণে যদিও তুমি পর্ব্বতস্থ অগ্নি প্রত্যক্ষ করিতে পারিতেছ না, তথাপি তুমি জানিলে পর্ব্বতে অগ্নি আছে। তুমি জানিয়াছ, পৃথিবীস্থ জীবগণ জন্মিতেছে, বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, সুখ-দুঃখের অধীন হইতেছে ও শেষে মরিতেছে। যদিও তুমি দেখিতেছ না যে পরে ঐরূপ হইবে কি না, তথাপি তুমি বুঝিতেছ যে, ভবিষ্যতেও এইরূপ হইবে, অর্থাৎ

কিছুই যে চিরস্থায়ী নহে তাহা তুমি বুঝিয়াছ। দার্শনিকেরা জ্ঞানের এই প্রকার কারণকে অনুমান বলিয়াছেন। কিন্তু বাস্তবিক উহা প্রত্যক্ষ ভিন্ন কিছুই নহে। ঐ সকল জ্ঞান সাক্ষাৎ ইন্দ্রিয়মূলক না হইলেও প্রত্যক্ষ মূলক। কেননা, উহার একদেশ এক বা অংশ আমাদের প্রত্যক্ষের বিষয় হইয়াছে।

দার্শনিকেরা এই সকল প্রকার প্রত্যক্ষকে বিভক্ত করিয়া প্রত্যক্ষ, শাব্দ, অনুমান প্রভৃতি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত করিয়াছেন। ফলতঃ বাহ্য ও আন্তরিক ইন্দ্রিয়প্রত্যক্ষই সমস্ত জ্ঞানের নিদান। যেমন মাঝি ভিন্ন কেবল দাঁড়ির দ্বারা নৌকা চলে না, কেবল দাঁড়ির ভরসায় নৌকা চালাইলে নৌকা চলা দূরে থাকুক তৎক্ষণাৎ বানচাল হয়, সেইরূপ কেবল ইন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষের উপর নির্ভর করিয়া জ্ঞান লাভ করিলে, জ্ঞান লাভ না হইয়া ভ্রান্তিই হয়। এই জন্য মাঝি স্বরূপে নিয়ত বুদ্ধিবৃত্তি সকলকে সঙ্গে রাখিতে হইবে। যত মাঝি ভাল হইবে, ততই নৌকা ঠিক চলিবে, ততই জ্ঞান সত্যপথে চলিবে। ঐ দাঁড়ি মাঝির সম্মিলনকে, বুদ্ধি ইন্দ্রিয়ের সম্মিলনকে, প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষের (শাব্দ) সম্মিলনকে যুক্তি বলে এবং তজ্জাত জ্ঞানের নাম বিজ্ঞান।

ফলতঃ যে বিজ্ঞানেরই আলোচনা করা হউক, যে জ্ঞানলাভেরই চেষ্টা করা হউক, ধারাবাহিক রূপে আলোচ্য বিষয়ের সর্ব্বাবয়ব নিরীক্ষণ না করিলে তদ্বিষয়ক প্রকৃত জ্ঞানলাভ হয় না। "সমকোণী ত্রিভুজের সম-কোণের সম্মুখস্থ বাহুর বর্গ সমকোণের পার্শ্বস্থ বাহুদ্বয়ের বর্গের যোগতুল্য" এই একটী সামান্য ক্ষেত্রতত্ত্বের প্রতিজ্ঞা সহজে বুঝা যায় না। জ্যামিতির পূর্ব্ববর্ত্তী ৪৬ টী প্রতিজ্ঞা ও স্বতঃসিদ্ধগুলি অগ্রে অধ্যয়ন না করিলে, কেহই এই তত্ত্ব বুঝিতে পারেন না। অথবা কেহ যদি এককালে ঐ প্রতিজ্ঞা বুঝিবার সময় ঐ প্রতিজ্ঞার প্রতিকৃতির উপর পূর্ব্ববর্ত্তী সমস্ত প্রতিজ্ঞার প্রক্রিয়া সাধন করিতে চেষ্টা করেন, তিনি তাহা বুঝিতে ত পারেনই না, অধিকন্তু নিতান্ত আকুল হইয়া পড়েন। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই ঐরূপ। কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতে হইলে, সেই জ্ঞান লাভের জন্য পূর্ব্বে যে যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক, অগ্রে ধারাবাহিক রূপে সেইগুলি জানিতে হইবে, তবে সে জ্ঞান লাভের উপযোগী হইতে পারা যাইবে। তাহাও

আবার উপযুক্ত শক্তি বা সামর্থ্য না থাকিলে হয় না। যাঁহার গণিতের উপযুক্ত বুদ্ধি নাই তিনি কখনও গণিত বিদ্যায় সম্যক্ পারদর্শী হইতে পারেন না।

আবার আলোচ্য বিষয়ের বাহ্য শক্তি বা একাংশ মাত্র দেখিয়া নিরস্ত হইলে প্রকৃত বিজ্ঞানালোচনা হয় না; বাহ্য, অভ্যন্তর সমস্তই অনুসন্ধান করা আবশ্যক। যে বায়ু পৃথিবীর নিকটবর্ত্তী স্থানে পূর্ব্বাভিমুখে প্রবাহিত হইতেছে, তাহা যে উপরে পশ্চিমাভিমুখে গমনশীল তাহা না জানিলে যেমন বায়ুর প্রকৃত গতি জানা হয় না, সেইরূপ পদার্থ সকলের আভ্যন্তরিক গুণ না জানিয়া আপাতদৃষ্ট বাহ্য গুণ মাত্র জানিলে তাহাদের গুণ জানা হয় না; সমস্ত জানা আবশ্যক। আধুনিক বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতেরা জানেন বিবাদ বা বিরুদ্ধ বল-প্রয়োগই জয়লাভের বা বিরুদ্ধ-শক্তি দমনের একমাত্র উপায়। সদ্ভাব বা বিরুদ্ধ-শক্তির অবিরোধাচরণ যে জয়ের প্রকৃত উপায় তাহা তাঁহারা জানেন না। তাঁহারা জানেন শরীরে তাপ লাগিয়াছে, শীতল করিলে তাপ যাইবে, অর্থাৎ শরীরস্থ তাপের সহিত বিরুদ্ধ-শক্তি হিমের দ্বন্দ্ব বাধাইতে পারিলে—হিমের বৃদ্ধি করিয়া তাপের অল্পতা করিয়া দিতে পারিলে, তাপের দমন হয়। তাঁহারা ইহা জানেন না যে, তাপের সহিত তাপের সম্মিলনে, অর্থাৎ তাপের উপর তাপ লাগাইতে পারিলে, তাপজনিত শারীরিক কষ্ট নিবারিত হয়। "বিষস্য বিষমৌষধম্" এই সারবান বাক্য তাঁহাদের বিজ্ঞানে অদ্যাপি প্রবিষ্ট হয় নাই। এই জন্য পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকদিগের মতে যে কোন দুঃখ বা অভাব উপস্থিত হউক, তাহা নিবারণ করিতে হইলে, তাহার বিপরীত অর্থাৎ অভাবের সদ্ভাব বা সম্ভোগ দ্বারা নিবারণ করিতে হইবে। সুতরাং ক্রোধরিপু উত্তেজিত হইলে পরানিষ্ট করা আবশ্যক, লোভরিপু জনিত কষ্ট দূর করিতে হইলে লোভনীয় পদার্থ প্রাপ্তির আবশ্যক, তাপ নিবারণ করিয়া শীতল হইতে হইলে শীতল বায়ু ও বরফ-জলের আবশ্যক, ইত্যাদি। তাঁহারা ভাবিয়া দেখেন না যে, ঐরূপে ইচ্ছা সকলের যত চরিতার্থ করা যায়, ততই সেই ইচ্ছা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় ও ক্রমে এমন অভ্যাস হইয়া পড়ে যে, তখন এক জনের অনিষ্ট দ্বারা ক্রোধ নিবারিত হয় না, অল্প দ্রব্য প্রাপ্তিতে লোভ চরিতার্থ হয় না, এক গ্লাস বরফ-জলে তাপ বিদূরিত হয় না, অল্প মদে নেশা হয় না ও অল্প কুইনাইনে জ্বর সারে না। যে ইচ্ছার যত চরিতার্থতা সম্পাদিত হয়, সে ইচ্ছা তত বলবতী হয় এবং সে ইচ্ছা

পূর্ণ করিতে তত অধিক ব্যগ্রতা জন্মে। সুতরাং কোন কালে প্রকৃত দুঃখ বা অভাবের নিবৃত্তি হয় না—তৃপ্তি সুখ কোন অবস্থাতেই লাভ হয় না।

নিস্বোবষ্টি শতং শতী দশশতং লক্ষং সহস্রাধিপো।
লক্ষেশঃ ক্ষিতিপালতাং ক্ষিতিপতিশ্চক্রেশ্বরত্বং পুনঃ॥
চক্রেশঃ পুনরিন্দ্রতাং সুরপতির্ব্রহ্মাস্পদং বাঞ্ছতি।
ব্রহ্মা বিষ্ণুপদং পুনঃ পুনরহো আশাবধিং কোগতঃ॥

দরিদ্র শতমুদ্রা পাইলে তুষ্ট হইবে বিবেচনাকরে,শতমুদ্রাবান সহস্র পাইলে সুখী হইবে ভাবে, সহস্রবান লক্ষ প্রার্থনাকরে, লক্ষপতি রাজত্ব কামনাকরে, রাজা সসাগরাপৃথিবীর অধিপতি হইতে চাহেন, সার্ব্বভৌমনরপতি ইন্দ্রত্বপদ, ইন্দ্র ব্রহ্মার পদ এবং ব্রহ্মা বিষ্ণুপদ বাঞ্ছা করেন। এই প্রকারে উত্তরোত্তর আশার বৃদ্ধি হইতেথাকে, কেহই আশার প্রান্তসীমায় যাইতে পারেন না।

ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়ো এবাভিবর্দ্ধতে॥

উপভোগ দ্বারা কামনা প্রশমিত হয় না; প্রত্যুত ঘৃত দ্বারা যেমন বহ্নি প্রদীপ্ত হয়, সেইরূপ ভোগ দ্বারা কামনা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

বাস্তবিক বিরোধ না করিয়া সম্মিলন সহ্য করিতে অভ্যাস করিলে দুঃখ নিবারিত হয়। সহ্য করিতে পারিলে, রৌদ্র আজি যে কষ্ট দিতেছে, কল্য তাহা দিবে না, পরশ্ব তাহাও দিবেনা; রিপু সকল আজি যে কষ্ট দিতেছে, সহ্য করিলে কালি তাহা দিবে না, পরশ্ব সে কষ্ট আরও মন্দীভূত হইবে। এই প্রকারে যে দুঃখের নিবৃত্তি হয়, সেই নিবৃত্তিই প্রকৃত নিবৃত্তি। সম্ভোগ দ্বারা যে দুঃখের নিবৃত্তি, তাহা বাস্তবিক নিবৃত্তি নহে। উহা অধিক দুঃখেরই কারণ।

এতদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভের উপযোগী আরও অনেক ব্যাপার আছে। সঙ্গীত-বিদ্যার উদাহরণ দ্বারা তাহার কিঞ্চিৎ বুঝাইবার চেষ্টা করা যাইতেছে। সঙ্গীতবিজ্ঞানে সা, রি, গা, মা, পা, ধা, নি, নামক সাতটী সুর সমস্ত প্রকার সুরের মূল বলিয়া ধৃত হইয়াছে; যাঁহার সুর বোধ হইয়াছে, তিনি ঐ সকল সুর প্রকৃত হইয়াছে কি না তাহা অনায়াসেই বুঝিতে পারেন। তানপুরার সুর বাঁধিবার সময় তাহার কান মোড়া দেওয়া হইতে থাকে ও তারে আঘাত করা হইতে থাকে। ঐরূপে মোড়া দিতে দিতে ঠিক যে সময়ে প্রকৃত

বৈজ্ঞানিক সুর বাহির হইবার উপযুক্ত তার কসা হয়, স্বরনিপুণ ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহা বুঝিতে পারেন; তুমি আমি কিন্তু কিছুই বুঝিতে পারি না। ঐরূপ তাল বা নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তরে সুরের ভেদ বুঝিবার শক্তি সঙ্গীতনিপুণেরই আছে, একটু বেতাল হইলেই তিনি বুঝিতে পারেন, তুমি আমি কিছুই বুঝিতে পারি না। সমস্ত বিজ্ঞান সম্বন্ধেই ঐরূপ। সুর ও তাল বুঝিবার শক্তি না জন্মিলে কোন তত্ত্বই বুঝিতে পারা যায় না। অগ্রে অন্ততঃ সুর তাল পর্য্যন্ত বুঝিয়া, তবে যুক্তি প্রয়োগের চেষ্টা করিতে হয়।

প্রত্যক্ষ যেমন আত্মপ্রত্যক্ষ ও পরপ্রত্যক্ষ ভেদে দুই প্রকার, বিজ্ঞানও সেইরূপ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভেদে দুই প্রকার। যে সকল বিষয়ের সত্যতা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা স্বয়ং উপলব্ধ করিতে পারা যায়, সেইগুলি প্রত্যক্ষ বিজ্ঞানের বিষয় এবং যে সকলের সত্যতা স্বয়ং সপ্রমাণ করিতে পারা যায় না কিন্তু পূর্ব্ব পণ্ডিতগণ উত্তম রূপে বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সে সকলের সত্যতা বুঝিয়াছিলেন, তাহা পরোক্ষ বিজ্ঞানের বিষয়। যেমন পরপ্রত্যক্ষের সহায়তা না লইয়া আত্মপ্রত্যক্ষ দ্বারা কিছুমাত্র জ্ঞানলাভ করা যায় না, সেইরূপ পরোক্ষ বিজ্ঞানের সহায়তা না লইয়া প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান দ্বারা কোন বিষয়েরই সত্যতা নির্ণীত হইতে পারে না। যিনি উভয় প্রকার বিজ্ঞানে পণ্ডিত হইয়াছেন তিনিই প্রকৃত জ্ঞানী। ভগবান বাসুদেব বলিতেছেন—

জ্ঞানবিজ্ঞান*তৃপ্তাত্মা কূটস্থো বিজিতেন্দ্রিয়ঃ।
যুক্ত ইত্যুচ্যতে যোগী সমলোষ্ট্রাশ্মকাঞ্চনঃ॥ ভগবদ্গীতা।

এই পরোক্ষ ও অপরোক্ষ জ্ঞানের মিলনকেই প্রকৃত যুক্তি বলে। এইজন্য যুক্তিযুক্ত বিজ্ঞান আমাদের প্রধান নেতা। প্রয়োজনীয় সমস্ত বিষয়ই বিজ্ঞানসম্মত হওয়া আবশ্যক। ধর্ম্মনীতি, রাজনীতি, সমাজনীতি, অর্থনীতি, পদার্থতত্ত্ব, শারীরতত্ত্ব, মনস্তত্ত্ব প্রভৃতি যাবতীয় বিষয়ই বিজ্ঞান দ্বারা স্থির হওয়া আবশ্যক; অধিক কি ইতিহাস, জীবনচরিত, পুরাতত্ত্ব প্রভৃতিকেও বিজ্ঞানের সীমা অতিক্রম করিতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা মানবের প্রধান অবলম্বনীয় ধর্ম্মশাস্ত্রকে বিজ্ঞানের অবিষয় বলেন। সাধনার অভাব ও বিজ্ঞানের এই সকল নিগূঢ়তত্ত্ব না বুঝাই ইহার কারণ।

* জ্ঞানং শাস্ত্রতআচার্যতশ্চ আত্মাদীনামবয়োধঃ, বিজ্ঞানং বিশেষতস্তমনুভবঃ ইতি শঙ্করঃ। জ্ঞানং শাস্ত্রাচার্য্যোপদেশজং, বিজ্ঞানং নিদিধ্যাসনজং ইতি স্বামী।

দেখা যাইতেছে, সামান্য সঙ্গীতবিজ্ঞানের সুর ও তালের জ্ঞানলাভ করিতেই কত সাধনার আবশ্যক। ঈশ্বরবিজ্ঞানের সুর তাল বুঝিতে যে তাহা অপেক্ষা বহুগুণে অধিক সাধনার প্রয়োজন তাহাতে আর কথা কি? এ পৃথিবীতে কয়জন সেরূপ সাধনা করিতে পারেন? কয়জনের সেরূপ উচ্চশক্তি, সেরূপ অধ্যবসায়, সেরূপ দীর্ঘ নীরোগ জীবন, সেরূপ অনন্য মন, সেরূপ অবসর ও সেরূপ প্রবৃত্তি আছে? অল্প উন্নতি করিলে মানব ঈশ্বর-জ্ঞান লাভ করিবার উপযুক্ত হয় না। জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি সামান্য বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞানলাভের উপযোগী লোকই যখন পৃথিবীতে নিতান্ত অল্প, তখন মহোচ্চ ঈশ্বরবিজ্ঞানে পারদর্শী হইবার উপযোগী লোক কত অল্প হওয়া সম্ভব? ঐ সকল ক্ষুদ্র বিজ্ঞানই শিক্ষা করিতে যখন আমাদের গুরুর নিতান্ত আবশ্যক, তখন ঈশ্বর-বিজ্ঞানের আর কথা কি? অন্ততঃ সুর ও তালবোধ পর্য্যন্ত গুরুর নিকট না শিখিলে যেমন সঙ্গীতবিদ্যা শিক্ষা হয় না, অন্ততঃ গণিতশাস্ত্র গুরুর নিকট না শিখিলে যেমন জ্যোতিঃশাস্ত্র শিখিবার অধিকারী হওয়া যায় না, সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট বিষয় পর্য্যন্ত গুরুর নিকট শিক্ষা না করিলে ঈশ্বরজ্ঞান লাভের অধিকারী হওয়া যায় না। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ঈশ্বরবিজ্ঞান সম্বন্ধে পাশ্চাত্য সভ্যতাপরায়ণগণ সম্পূর্ণ বিপরীত ব্যবহার করিয়া থাকেন। অগ্রে গুরুর নিকট কিয়ৎ পরিমাণ শিক্ষা করিয়া সকল বিজ্ঞানেরই সত্যাসত্য নির্ণয়ের চেষ্টা করা হয়, কিন্তু ঈশ্বরনিরূপণ করিবার সময়ে প্রত্যেকেই ক, খ, বা ১, ২ হইতে বৈজ্ঞানিক তর্ক আরম্ভ করেন, কোন স্থানেই কাহারও সহায়তা লইতে চাহেন না, একদিনেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব বা নাস্তিত্ব বুঝিয়া লয়েন। এই জন্য তাঁহারা ঈশ্বরবিজ্ঞানের ও ধর্ম্মবিজ্ঞানের কিঞ্চিন্মাত্রও বুঝিতে পারেন না। গুরু-বাক্যানুসারে সাধনা করিয়া বুঝিবার উপযোগী না হইলে, ঈশ্বরবিজ্ঞান কি কোন বিজ্ঞানেই জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায় না। আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করিয়া বিজ্ঞানানুশীলন করিলে, তবে ধর্ম্মবিজ্ঞান ও ঈশ্বরবিজ্ঞানে অভিজ্ঞতা জন্মে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

আপ্তবাক্য।

আধুনিক শিক্ষিতদল পরোক্ষবিজ্ঞানের নিতান্ত বিদ্বেষী। তাঁহাদের মতে স্বাধীনতা মানবের প্রধান ধন, সে ধন নষ্ট হইলে মানবের মানবত্বই থাকে না; পরের বাক্যানুসরণ করিলে সেই সকল সুখের হেতু স্বাধীনতার হানি হয়। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি মানব কি আপনা আপনি বুঝিয়া সমস্ত কার্য্য করিতে পারে? সমস্ত দূরে থাকুক কিছু কার্য্যও কি করিতে পারে? কখনই না। প্রত্যক্ষবিজ্ঞান জ্ঞানের মূল কারণ হইলেও কেবল তদবলম্বনে মানব প্রকৃত জ্ঞান লাভের অধিকারী হয় না। প্রত্যুত সকল লোককেই অধিকাংশ সময়ে পরোক্ষ বিজ্ঞানের অবলম্বনে চলিতে হয়। কোন বিজ্ঞানই পরোক্ষ বিজ্ঞানের সহায়তা ভিন্ন সম্পূর্ণ হয় না। যদি পরোক্ষ বিজ্ঞানে মানবের বিশ্বাস না থাকিত, যদি সকলকে সকল অবস্থাতেই বৈজ্ঞানিক যুক্তি অবলম্বনে চলিতে হইত, তাহা হইলে মানবের দুঃখের সীমা থাকিত না। অধিক কি তাহা হইলে মানবের অস্তিত্বই থাকিত না।

মানব ভূমিষ্ঠ হইয়াই সর্ব্বপ্রকারে পরের অধীন হয়; কেবল পরের বাক্যের অধীন নয়, সর্ব্বপ্রকারেই পরের অধীন হয়। পরে খাওয়াইলে খাইতে পায়, পরে রক্ষাকরিলে রক্ষিত হয়; অন্যে যাহা শিখায় শিশু তাহাই শিখে। শিশু বিদ্যা শিক্ষা করে, এ কথার অর্থ এই যে গুরু যাহা বলেন, গ্রন্থকর্ত্তা যাহা বলেন বালক তাহাই শিখে—পিতা, মাতা, গুরু ও অন্য বিজ্ঞ লোকে যে উপদেশ দেন, যে নীতি শিক্ষা দেন শিশু তাহাই শিখে ও তদনুযায়ী কার্য্য করে। বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত হইয়াছে এ কথার অর্থ এই যে, অন্য লোকের পরিজ্ঞাত প্রয়োজনীয় জ্ঞাতব্যগুলি শিক্ষা করা হইয়াছে—যাঁহাদের মতামত সত্য বলিয়া জানা আবশ্যক তাহার অধিকাংশ জানা হইয়াছে। সেই মহাজন-পরিজ্ঞাত উপদেশগুলি স্মরণ করিয়া, যথাযোগ্য স্থানে প্রয়োগ

করিয়া কার্য্য করিতে পারিবে বলিয়া শিক্ষিতের এত মান। তাই শিক্ষিত ব্যক্তি জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয়েন। আপন বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া স্বাধীনভাবে কার্য্য করেন বলিয়া শিক্ষিতের মান নহে। আপন বিবেচনায় কার্য্য করার জন্য মান হইলে মূর্খেরই মান হইত—পশুপক্ষ্যাদিরই মান হইত। শিক্ষিত ব্যক্তি জানিয়াছেন, কিরূপ স্থলে কিরূপ কার্য্য করিয়া লোকে কিরূপ ফল পাইয়াছে, প্রাচীন ও বিজ্ঞগণ কিরূপ কার্য্য করিয়া সুফল প্রাপ্ত হইয়াছেন; সেই সমস্ত স্মরণ করিয়া যথাপ্রয়োগ করিতে পারেন বলিয়াই শিক্ষিতের এত মান। মূর্খ তৎসমস্ত জানে না, সুতরাং আপন বুদ্ধি ও প্রকৃতি অনুসারে যতদূর সম্ভব তাহাই মাত্র করে, এই জন্যই মূর্খের কার্য্যের এত দোষ ও এত নিন্দা। মূর্খেরা যে কিছুই শিক্ষা করে না,—আদৌ পরমতাবলম্বনে চলে না, তাহা নহে। মূর্খেরাও শিক্ষা করে, কিন্তু তাহা প্রচুর নহে। তাহারা প্রকৃত জ্ঞানীর উপদেশ অল্পই শিখিতে পারে ও সকল অবস্থার উপযোগী জ্ঞাতব্য সকলও জানিতে পারে না। বস্তুতঃ কি মূর্খ কি পণ্ডিত সকলেই বাল্যকাল হইতে বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত যে কিছু কার্য্য করে, সমস্তই পরের বাক্যানুসরণে করিয়া থাকে, নিজ মতে কেহই কার্য্য করে না। তবে প্রবল বৃত্তিবিশেষের অধীন হইয়া কখন কখন মানব পরবাক্যের অন্যথাচরণ করিয়া কার্য্য করিয়া থাকে বটে—পরধন দেখিয়া লোভবান হইয়া 'চুরি করিতে নাই' ইত্যাদি পরকীয় বাক্যের অন্যথা করিয়া লোভাদি প্রবৃত্তির অনুযায়ী পরস্বাপহরণ প্রভৃতি করে বটে, কিন্তু তদ্রূপ আচরণ স্বাধীনতা মূলক বা স্বমতানুযায়ী নহে। তদ্রূপ কার্য্যকারী স্বেচ্ছাচারিগণ ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকলের অধীন এবং তস্কর, সুরাপায়ী প্রভৃতি অসৎ লোকের শিক্ষাধীন।

আধুনিক শিক্ষিতদল বিবেচনা করেন তাঁহারা আপন স্বাধীন বিবেচনায় কার্য্য করেন। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, তবে ইংরাজী না পড়িলে ও ইংরাজী ব্যাপার সকল না দেখিলে কাহারও তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীন বুদ্ধি ও স্বাধীন মত হয় না কেন? এবং যিনিই ইংরাজি পড়েন তিনিই তাঁহাদের ন্যায় স্বাধীনবুদ্ধি হন কেন? যিনি টোলে পড়েন তিনি শিখা রাখিতে, ফোঁটা কাটিতে, উপবাস ও হবিষ্যান্ন ভোজন করিতে শিখেন কেন? আর যিনি স্কুলে পড়েন তিনি চুল ফিরাইতে, পমেটম মাখিতে ও পলাণ্ডু, মদ্য, মাংস

ভক্ষণ করিতে শিখেন কেন? শিক্ষাই যদি ইহার একমাত্র কারণ না হয়, তবে উক্তরূপ শ্রেণীবিশেষের সকলেই একরূপ আচরণ সম্পন্ন হয় কেন? বাস্তবিক যেমন গুরু তেমনি শিক্ষা, ও যেমন শিক্ষা সেইরূপ কার্য্য। যিনি যাহা করেন সমস্তই পরের বাক্যানুসারে করেন, নিজ মতে কেহই কিছু করেন না। নিজ মতে কার্য্য করি বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে যে, যাহা যাহা আমি শিখিয়াছি তাহার মধ্যে যেটী আমার প্রকৃতি অনুসারে বা অপেক্ষাকৃত অধিক অভ্যাস হওয়ায় ভাল লাগিয়াছে, তদনুরূপ করিতেছি, নিজ উদ্ভাবিত মতানুসারে করিতেছি না।

সত্য বটে কেহ কেহ নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার, নূতন মত স্থাপন ও নূতন চিন্তার ফল প্রচার করিয়া থাকেন। কিন্তু সেরূপ লোক অতি বিরল; এবং তাঁহারাও নিজ চিন্তার ফল নিজে প্রায়ই ভোগ করিতে পারেন না। তাঁহাদের কার্য্যের ফল প্রায়ই পরানুগত হয়। কেন না মানব অল্প বয়সে নূতন চিন্তা করিতে সক্ষম হয় না এবং যখনই নূতন চিন্তা প্রথমে মনে উদিত হয়, তখনই সে চিন্তার ফললাভ হয় না; অনেক পরীক্ষা ও অনেক গবেষণার পর সে চিন্তার ফল জন্মে। আবার ফল জন্মিলেই তদনুসারে নিজে কার্য্য করিতে পারা যায় না। কারণ অভ্যাস ও সংস্কার ছাড়িতে পারা বড় সহজ নহে। অন্যকে তাহা শিখাইতে পারা যায় বটে, কিন্তু সহসা আপনি তদনুরূপ ব্যবহার করিতে পারা যায় না। যদিও স্বীকার করা যায় যে, অনেক চেষ্টা করিয়া কেহ কেহ তদনুরূপ কার্য্য করিতে সক্ষম হয়েন, কিন্তু তাহা অল্প বয়সে হইতে পারে না। সেরূপ শক্তি সম্পন্ন হইবার পর প্রায়ই কেহ অধিক দিন বাঁচে না। সুতরাং যখন কার্য্য করিবার কাল তখন, অর্থাৎ শৈশব, বাল্য, যৌবন ও প্রৌঢ়কালে পরানুবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইল, যখন কার্য্যত্যাগের সময় সেই বৃদ্ধকালে স্বানুবর্ত্তী হইবার শক্তি জন্মে। তাহাও কি সকল বিষয়ে কেহ স্বমত স্থাপন করিতে পারেন? কখনই না। যে বিষয়ে প্রগাঢ় চিন্তা ও গবেষণা করিয়াছেন সেই বিষয়েরই মাত্র নূতন সিদ্ধান্ত করিতে সক্ষম হয়েন। অপর লক্ষলক্ষ বিষয়ে পূর্ব্ববৎ পরানুবর্ত্তী হইয়া থাকিতে হয়। আবার পূর্ব্বে রীতিমত শিক্ষা না করিলে নবসত্য স্থির করিবার শক্তি জন্মে না। সুতরাং মানব নিজ উদ্ভাবিত মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারেনাই বলিতে হয়।

বাস্তবিক মানবের অধিকার ও শক্তি কি? মানব কতদিন বাঁচে ও

কতটুকু স্থান অবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করে? পরের জ্ঞান-নিরপেক্ষ হইয়া কিছুতেই মানব সকল কালের, সকল দেশের ও সকল বিষয়ের সম্যক্ জ্ঞান-লাভ করিতে পারে না। এই রেলওয়ে, টেলিগ্রাফ, অট্টালিকা ও মুদ্রাযন্ত্র; এই জ্যোতিষ, রসায়ন,পদার্থবিদ্যা,উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও শারীরবিদ্যা; এই সমাজ-নীতি, রাজনীতি ও ধর্ম্মনীতি কি একজনের চেষ্টায় হইতে পারে? লক্ষ লক্ষ বৎসর লক্ষ লক্ষ মানব যাহা শিখিয়াছে, তাহা যদি স্তূপাকারে সজ্জিত না হইত তাহা হইলে কি মানব এ সকলের ফলভোগ করিতে পারিত? যদি ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই মানব নিজ চেষ্টায় কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিত তাহা হইলেও কি একজন মানব আপন জীবৎকালে ইহার কোটীতম অংশ পরি-মিত কার্য্য করিতে পারিত? কখনই না। চিরজীবন অতি কঠোর চেষ্টা করিলেও মানব স্বদেশেরই সমুদায় দেখিতে পারে না। কিন্তু অসংখ্য দেশ, সাগর, পর্ব্বত, অরণ্য প্রভৃতি রহিয়াছে; অসংখ্য গ্রহ, নক্ষত্র, সূর্য্য প্রভৃতি রহিয়াছে; অসংখ্য পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, জল, স্থল, বায়ু, আকা-শাদি জড়াজড় পদার্থ সকল রহিয়াছে,—ভূতত্ত্ব, রসায়ন, প্রাণিতত্ত্ব, উদ্ভিদ্-বিদ্যা, শারীরস্থান, চিকিৎসা, শিল্প, বাণিজ্য, কৃষি প্রভৃতি অসংখ্য বিষয় রহিয়াছে; মানব একা কত দেখিবে? সমস্ত দূরে থাকুক, নিতান্ত প্রয়োজনীয় বর্ব্বর জাতির পরিজ্ঞাত বিষয়গুলিও কেহ চিরজীবনে আপন চেষ্টামাত্রে শিখিতে পারে না।

আবার এমত অনেক বিষয় আছে যে, তৎসমস্ত চেষ্টামাত্রের উপর নির্ভর করিয়া শিখিতে পারাই যায় না। কেন না একবার হাত পোড়াইয়া স্বচেষ্টা মাত্রে 'অগ্নিতে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায়,' এ তত্ত্ব শিখিতে পারাযায় বটে, কিন্তু বিষ খাইয়া মরিয়া গিয়া ত 'বিষ খাইলে মানুষ মরে' এ তত্ত্ব শিখিতে পারা যায় না! অন্যকে বিষ খাইয়া মরিতে দেখিয়াই বা কয় জন এ তত্ত্ব শিখিতে পারে? সর্ব্বথা পরের শিক্ষাধীন না হইলে মানব একদিনও পৃথিবীতে বাস করিতে পারে না। নিজ চেষ্টায় মানবকে চলিতে হইলে তাহাকে এক দিনেই পৃথিবীর মায়া কাটাইতে হইত। নিজ চেষ্টায় রক্ষিত হইতে পারে এ কথা এক দিন পশু পক্ষীরা বলিতে পারে। কেন না ঈশ্বর স্বয়ং তাহাদের সাক্ষাৎ রক্ষক, তিনি তাহাদিগকে স্বাধীনভাবে চলিবার শক্তি দিয়াছেন। মানবকে সে শক্তি ঈশ্বর দেন নাই। ঈশ্বর মানবকে

সর্ব্বপ্রকারে পরপ্রত্যাশী করিয়াছেন। সকল মানবই পরস্পর পরস্পরের অধীন;—শিশু যুবার অধীন, যুবা বৃদ্ধের অধীন, প্রজা রাজার অধীন, শিষ্য গুরুর অধীন, স্ত্রী পুরুষের অধীন। এই অধীনতাই মানবত্ব এবং স্বাধীনতাই পশুত্ব। পশু ও মানবের ইহাই প্রকৃত প্রভেদ। পশুর আপনিই সর্ব্বস্ব, মানবের সকলই আপনার। পশু শিখিবে না, শিখাইবে না। মানব শিখিবে ও শিখাইবে,—যেরূপ পরের নিকট শিখিবে সেইরূপ কার্য্য করিবে—যেরূপ আপনি শিখিবে সেইরূপ পরকে শিখাইবে। অতএব স্বাধীনতা আমাদের প্রধান ধন নহে। সুতরাং স্বাধীনতার হানি হয় বলিয়া পরবাক্য অনুসারে চলিব না বা পরবাক্য সত্য মনে করিব না, একথা বলা নিতান্ত যুক্তি বিরুদ্ধ।

যদি বল যত দিন মানবের বুঝিবার উপযোগী শক্তি না জন্মে, ততদিন পরের মতানুসারে চলিতে হয় বটে, কিন্তু বুঝিবার শক্তি জন্মিলে পরমতাবলম্বনে চলার আবশ্যকতা থাকে না; তখন, পূর্ব্বে যে সকল বিষয় শিক্ষা করা হইয়াছে, তন্মধ্যে যাহা যাহা আপন বিবেচনার সহিত মিলে অথবা যাহা যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয়, তদনুসারে চলা উচিত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, বুঝা কাহাকে বলে? দেখা যাইতেছে তুমিও বুঝিয়াছ মনে কর, আমিও বুঝিয়াছি মনে করি; অথচ তোমার মত ও আমার মত সম্পূর্ণ বিপরীত। যখন উভয়েই বুঝিয়াছি, তখন এরূপ বিপরীত ফল হয় কেন? তোমার সহিত আমার মতদ্বন্দ্ব হয় কেন? সুতরাং বলিতে হইবে, তুমি ও আমি দুই জনে কখনই ঠিক বুঝি নাই। কিন্তু কাহার বুঝা সত্য? সকলেই বিবেচনা করে আমি বুঝিয়াছি। অতি মূর্খও আপন মতকে বজায় রাখিবার জন্য পণ্ডিতের সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করে এবং অতি শিশুও বৃদ্ধের মতকে ভ্রান্ত মনে করে। কিন্তু বাস্তবিক যাহারা বুঝিয়াছে মনে করে, তাহারা কি প্রকৃতই বুঝিয়াছে? ঐ যে অজাতশ্মশ্রু বালকগণ স্ত্রীস্বাধীনতা স্ত্রীস্বাধীনতা করিয়া ক্ষেপিয়া বেড়াইতেছে, উহারা স্ত্রী কি পদার্থ তাহাই কি কিছু বুঝিয়াছে? না স্ত্রীপুরুষের সচ্ছন্দবিহারে কি ভাল কি মন্দ ফল হইতে পারে তাহা কিছু বুঝিয়াছে? উহারা কি আপনারা ভাবে যে তাহা উহারা বুঝে নাই? ঐ যে বালকটী মনে মনে শিক্ষককে গালি দিতেছে ও কি বুঝিয়াছে যে, শিক্ষক তাহার হিতকারী? ঐ যে তস্করটী দণ্ডাজ্ঞা পাইয়া বিচারকের প্রতি অজস্র

গালিবর্ষণ করিতেছে, ও কি বুঝিয়াছে যে, বিচারক ন্যায়কার্য্য করিয়াছেন? ঐ যে হিন্দু ও খৃষ্টান ধর্ম্মসম্বন্ধে ঘোরতর দ্বন্দ্ব করিতেছে, উহারা কি উভয়েই বুঝিয়াছে আপনার অবলম্বিত ধর্ম্ম সত্য? কখনই না, অথচ সকলেই বুঝিয়াছে মনে করে। বুঝিবার নিয়ম সর্ব্বত্রই এইরূপ। যাহার যেমন শিক্ষা, যেমন সংসর্গ, যেমন স্বভাব, যেমন বুদ্ধি, যেমন আবশ্যক সে সেইরূপ বুঝে। ঐ প্রত্যেক বুঝাকে বুঝা বলিব? না ঐ প্রত্যেক বুঝার উপর নির্ভর করিয়া মত নির্ব্বাচিত হইবে? আমরা স্পষ্ট দেখিয়া বুঝিতেছি সূর্য্য একখানি থালার মত, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন উহা পৃথিবী অপেক্ষা চৌদ্দলক্ষগুণ বড়,—আমরা স্পষ্ট দেখিয়া বুঝিতেছি সূর্য্য পৃথিবীর চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছেন, কিন্তু জ্যোতির্ব্বিদ্ বলেন পৃথিবী সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতেছে। এক্ষণে আমাদের বুঝাকে সত্য বলিব, না জ্যোতির্ব্বিদের কথা সত্য বলিব? যদি বল জ্যোতির্ব্বিদ্ যে প্রমাণের বলে ঐ সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছেন, তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলে, আমরা জ্যোতির্ব্বিদের কথা গ্রাহ্য করিব। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, কয়জন লোকের তাহা বুঝিবার শক্তি আছে? কেবল জ্যোতির্ব্বিদ্যা আমাদের জ্ঞাতব্য নহে, অসংখ্য তত্ত্ব আমাদের জ্ঞাতব্য। এ পৃথিবীতে কয়জন সে সকলের সূক্ষ্মানুসন্ধান বুঝিতে পারে? ঐ সকল বুঝিবার শক্তিলাভ করিতে যে শিক্ষার আবশ্যক, কয়জন সেরূপ শিক্ষালাভ করিতে পারে? কয়জন তদ্রূপ শিক্ষালাভের উপযোগী বুদ্ধি ও অবস্থা লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে? সকল বিষয় বুঝা দূরে থাকুক, দুই একটী বিষয় বুঝিতে পারে এমত লোকই নিতান্ত অল্প। অতএব বুঝিতে পারি নাই বলিয়াই পরের নির্ণীত সত্যে বিশ্বাস না করা বা পরনির্ণীত সত্যের ভ্রান্তি বুঝিয়াছি ভাবিয়াই তাহাতে অবিশ্বাস স্থাপন করা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। এরূপ করিলে সত্য নির্ণয় করিতে বা সত্যপথে চলিতে প্রায় কেহই পারে না।

তবে কি পরোক্ষজ্ঞান মাত্রই সত্য? তাহা কখনই নহে। কেন না অপ্রত্যক্ষ ও প্রত্যক্ষবিজ্ঞানে যেমন পদে পদে ভ্রম থাকে, পরের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষজ্ঞানেও সেইরূপ ভ্রম থাকে। যে যে কারণে প্রত্যক্ষবিজ্ঞান ভ্রমপূর্ণ হয়, পরোক্ষ বিজ্ঞানেও সে সকল কারণের বিদ্যমানতা আছে, অধিকন্তু অনেক সময়ে অনেকে স্বার্থসাধনমানসে ও কুপ্রবৃত্তিপ্রেরিত হইয়া

মিথ্যাকে সত্য বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন। সুতরাং উভয়েরই যথা সংস্কার আবশ্যক। যে বিষয় বুঝিবার আমাদের নিজের সামর্থ্য নাই, তাহাই পরবাক্য অবলম্বনে জানিতে হয়। সুতরাং যেরূপ ব্যক্তির নিকট তাহা জানিতে পারা সম্ভব, অর্থাৎ শক্তি ও চরিত্রে যিনি শ্রেষ্ঠ ও বিশ্বাসী, তাঁহারই নিকট তাহা জানা আবশ্যক। শিশু বৃদ্ধের নিকট এবং মূর্খ পণ্ডিতের নিকট, জিজ্ঞাসা করিয়া সত্য অবগত হইতে পারে। কিন্তু শিশু বা মূর্খ যদি আর একটি শিশু বা আর একজন মূর্খের বা কোন বঞ্চকের নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া অবগত হয়, তাহা হইলে কখনও প্রকৃত জ্ঞান লাভ হয় না। যে ব্যক্তির যে বিষয়ে প্রকৃত জ্ঞান নাই, তাহার নিকট হইতে তদ্বিষয়ক সত্য জ্ঞাত হইবার সম্ভাবনা কোথায়? যে প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়াছে, তাহার বাক্যই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। যাহার তাহার বাক্য সত্য মনে করিতে হইবে না। এক্ষণে কথা এই যে, কাহার বাক্য সত্য তাহা জানিব কি প্রকারে? যখন আপন বিবেচনার উপর নির্ভর করিয়া মত নির্ব্বাচন করিলে সত্য নির্ণীত হয় না, প্রত্যুত ভ্রান্তি হইবারই সম্ভাবনা, তখন কি প্রকারে বুঝিব কাহার বাক্য সত্য? কি প্রকারে সহস্র সহস্র লোকের সত্য বলিয়া প্রচারিত সহস্র সহস্র প্রকার মতের মধ্য হইতে সত্য নির্ব্বাচিত হইবে? ইহারই উপায় নির্দ্ধারণ করিবার জন্য যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন 'মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা।' জ্ঞানীসম্প্রদায় যে বাক্যকে সত্য বলিয়া গণ্য করেন তাহাকেই সত্য মনে করিতে হইবে। তাই সত্য নিরূপণ জন্য গুরুর আশ্রয় গ্রহণ আবশ্যক। প্রাচীনপণ্ডিতগণ যে সকল তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছেন তাহা ভ্রান্তিদূষিত কি না, তাহার পরীক্ষা উপযুক্ত পণ্ডিতগণই করিবেন। সাধারণের সে বিচার করিবার অধিকার নাই। পণ্ডিতগণ যে পরোক্ষবিজ্ঞানকে সত্য বলেন, তাহাই সত্য বলিয়া মানিতে হইবে। তাহারই নাম আপ্ত বাক্য—তাহার সত্যতা প্রমাণনিরপেক্ষ। পণ্ডিতেরও কখন কখন ভ্রম হয় বটে, কিন্তু সমস্ত জ্ঞানী সম্প্রদায়েরই একবিধ ভ্রম হওয়া নিতান্ত অসম্ভব; হইলেও তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয় না। কেন না তদ্ভিন্ন মানবের গত্যন্তর নাই। কারণ আত্মপ্রত্যক্ষ, পরপ্রত্যক্ষ, প্রত্যক্ষ বিজ্ঞান ও পরোক্ষবিজ্ঞান এই কয়েকটীই জ্ঞান লাভের উপায়। এতদ্ভিন্ন জ্ঞানলাভের অন্য কোনও উপায় নাই। অথচ ঐ সকল উপায়েই

ভ্রান্তি আছে। যদি ভ্রান্তিভয়ে পরপ্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বিজ্ঞান অবিশ্বাস করিতে হয়, তবে বিজ্ঞানবাক্য ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানকেও অবিশ্বাস করিতে হইবে। সুতরাং তাহা হইলে কোন জ্ঞানকেই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারা যায় না। কিন্তু জ্ঞানে বিশ্বাস না থাকিলে কোন কার্য্যই সাধিত হয় না। যেমন চিকিৎসকের চিকিৎসায় বিশ্বাস না থাকিলে রোগ আরাম হয় না, যেমন গুরুর বিদ্যার প্রতি বিশ্বাস না থাকিলে বিদ্যালাভ হয় না, সেই রূপ সত্যে বিশ্বাস না থাকিলে কার্য্যকুশলী হওয়া যায় না। কোন বিষয়ে সফলকাম বা সুখী হইতে পারা যায় না।

বাস্তবিক বিজ্ঞানবাক্য অপেক্ষা আপ্তবাক্য অধিক ভ্রমাত্মক নহে, অথবা আপ্তবাক্য ও বিজ্ঞানবাক্য একই কথা। বরং স্থলবিশেষে বিজ্ঞানবাক্য অপেক্ষা আপ্তবাক্য অধিকতর সত্যনির্দ্দেশক। বিজ্ঞানবাক্য ও আপ্তবাক্যের প্রভেদ বুঝিতে পারিলেই এ কথা বুঝা যাইবে। যাহা চেষ্টা করিলে যুক্তি বা প্রত্যক্ষ প্রমাণাদি দ্বারা বুঝিয়া লওয়া যায়, তাহাকেই বিজ্ঞানবাক্য বলিয়া থাকে। আর যে বাক্য ঐরূপে বুঝিতে পারা সহজ নহে, অথচ তাহা পূর্ব্বমনীষিগণ বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন তাহাই আপ্তবাক্য। পূর্ব্বপ্রতিপন্ন বলিয়া আপ্তবাক্যের নব প্রমাণের আবশ্যকতা নাই। সুতরাং মূলতঃ ও ফলতঃ বিজ্ঞানবাক্য ও আপ্তবাক্য এক—উভয়ই যুক্তি অবলম্বনে স্থিরীকৃত। পারদ ও গন্ধক-সংযোগে হিঙ্গুল হয়, অম্লকর ও জলকর বায়ু সংযোগে জল হয়, চন্দ্র সূর্য্য, ও পৃথিবী সমসূত্রপাতে অবস্থিত হইলে গ্রহণ হয়, গ্রহ নক্ষত্রাদি জ্যোতিষ্কমণ্ডলী আকাশের যে স্থানে আছে বোধ হয় ঠিক সে স্থানে নাই, উহার আলোক রেখা বক্রীভূত হইয়া আসাতে উহাদিগকে স্থানান্তরে পরিলক্ষিত হইতেছে, ইত্যাদি বাক্য বিজ্ঞানবাক্য। কেন না ঐ সকলের সত্যতা প্রত্যক্ষ দেখিয়া লওয়া যাইতে পারে, শিক্ষার্থীকে বুঝাইয়া দেওয়াও যায়। কিন্তু চুরি করা, মিথ্যা কহা, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের অধীন হওয়া, পরানিষ্ট করা প্রভৃতি অন্যায় কার্য্য এবং পরোপকার ও দান করা, রিপু ও ইন্দ্রিয়ের দমন করা, সত্য কহা প্রভৃতি সৎকর্ম্ম এ সকল বাক্য আপ্তবাক্য বলিয়া মানিতে হয়। কারণ এ সমস্তেরই হিতকারিতা বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে; কিন্তু সকলকে প্রত্যক্ষদর্শনের ন্যায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় না, শিক্ষার্থী-

রাও সহজে বুঝিতে পারে না। কেন না, ঐ সকল পাপের, রাজদণ্ড ও সামাজিক দণ্ড প্রাপ্তিরূপ অনিষ্ট ব্যতিরেকে আর কোনরূপ অবশ্যম্ভাবী অপকার দেখান যায় না। প্রত্যুত অনেকে চুরি করিয়া, মিথ্যা কহিয়া ও পরানিষ্ট প্রভৃতি দ্বারা অতুল অর্থোপার্জ্জন করেন এবং অনেকে সত্যপরায়ণ ও দয়াবানাদি হইয়া এক কালে নিঃস্ব হইয়া পড়েন। পাপপরায়ণের বাহ্যসুখ ও পুণ্যবানের বাহ্য দুঃখ পাওয়ার উদাহরণ অল্প দৃষ্ট হয় হয় না। সুতরাং পাপানুষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবী কুফল ও পুণ্যানুষ্ঠানের অবশ্যম্ভাবী সুফলের বিষয় প্রত্যক্ষ প্রমাণ দ্বারা প্রতিপন্ন করা সহজ নহে। এই জন্য যাঁহারা আপ্তবাক্য বিশ্বাস করেন না, তাঁহারা ঈশ্বর, পরকাল ও পাপপুণ্য প্রভৃতিকে কল্পনা-সমুদ্ভূত বলেন। বাস্তবিক যে ঐ সকল প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ. তাহা তাঁহারা বুঝেন না।

আর একটু বিশদ করিবার জন্য আমরা একটী বিজ্ঞানের কথা লইয়া আপ্তবাক্যের লক্ষণ বুঝাইয়া দিবার চেষ্টা করিব। মনে কর, সহস্র বৎসর পূর্ব্বে কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ আকাশস্থ জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর আকার, প্রকার, অবস্থান ও গতি প্রভৃতির বিবরণ পত্রে একটী ধূমকেতুর সম্পূর্ণ বিবরণ লিপি-বদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। দেড়শত বৎসর পরে আর এক জন জ্যোতির্ব্বিদ্ ঐরূপ একটি ধূমকেতু গগণে উদিত হইতে দেখেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণের তালিকালিখিত ধূমকেতুর সহিত উহার আকারাদি মিলাইয়া দেখিলেন, ১৫০ বৎসর পূর্ব্বে দৃষ্ট ধূমকেতুর আকারাদির সহিত ইহার সম্পূর্ণ মিল আছে। তিনি তদ্বিবরণ লিখিয়া যান এবং মনে করেন মধ্যবর্ত্তী জ্যোতির্ব্বিদ্গণ হয় সেটী দেখিতে পান নাই, অথবা একালমধ্যে সে ধূমকেতু আর উদিত হয় নাই। পুনরায় ১৫০ বৎসর পরে অন্য এক জন ঐ ধূমকেতু দেখিয়া পূর্ব্ববর্ণিত ধূমকেতু বলিয়া চিনিতে পারেন। এই প্রকারে ৮।৯ শত বৎসর ক্রমাগত ১৫০ বৎসর অন্তর ঐরূপ ধূমকেতুর উদয়ের বিবরণ দেখিয়া ও নানা প্রকার যুক্তি অবলম্বন করিয়া কোন জ্যোতির্ব্বিদ্ স্থির করিলেন ঐ ধূমকেতু ১৫০ শত বৎসরে একবার পৃথিবী প্রদক্ষিণ করে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে ইহা বিজ্ঞানবাক্য হইয়াও আপ্তবাক্য। কেন না, কেবলমাত্র নিজ প্রত্যক্ষ দ্বারা ঐ বাক্যের সত্যতা স্থির করিবার শক্তি কোন ব্যক্তিরই নাই। সুতরাং যদি ঐ বাক্যকে আমরা

আপ্তবাক্য বলিয়া বিশ্বাস না করি, তবে ঐ জ্ঞান হইতে আমরা একবারে বঞ্চিত থাকি।

বিজ্ঞান ও আপ্তবাক্যের আর একটু প্রভেদ আছে। যে সকল প্রাচীন মহাত্মাগণ প্রকৃত তত্ত্বদর্শী ও সত্যানুরাগী বলিয়া প্রথিত, তাঁহাদের বাক্য যুক্তি দ্বারা প্রমাণযোগ্য হউক বা না হউক, তাঁহাদের ব্যাক্যের প্রমাণের আবশ্যকতা নাই বিবেচনা করিয়া লোকে আপ্তবাক্যের ন্যায় বিশ্বাস করে। কিন্তু এক্ষণে যদি কেহ কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করেন, তাহা প্রত্যক্ষ প্রমাণ ব্যতীত কেহই সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিবে না। তাঁহাকে তাহা সম্পূর্ণ রূপে সপ্রমাণ করিতে হইবে। কিন্তু ঐ ব্যক্তি যদি কালে প্রাচীনগণের ন্যায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া যান, তাহা হইলে সে সময়ে তাঁহার বাক্য আপ্তবাক্যের ন্যায় গণ্য হইবে। সুতরাং স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যাহা পূর্ব্বে বিজ্ঞানবাক্য ছিল, তাহারই কতকগুলি, অর্থাৎ যেগুলির সত্যতা বিষয়ে অধিক লোকের সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিয়াছিল, সেইগুলি এক্ষণে আপ্তবাক্যরূপে পরিগণিত; এবং এক্ষণে যাহা বিজ্ঞানবাক্য বলিয়া কথিত, কালে তাহার কতকগুলি আপ্তবাক্য বলিয়া পরিগণিত হইবে।

যে বিজ্ঞানবাক্য বহুতর লোকে বহুকাল হইতে বিনা প্রমাণপ্রয়োগে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে, সুতরাং যে প্রমাণাদির বলে তাহার সত্যতা স্থিরীকৃত হইয়াছিল, তাহার ব্যবহারের আবশ্যকতা না থাকায়, তাহার অপ্রাপ্তি ঘটিয়াছে, তাহাই আপ্তবাক্য বলিয়া অভিহিত হয়। অভ্রান্ত সত্য মনে করাতে উহার প্রমাণ প্রয়োগের এত অল্পতা দৃষ্ট হয়। বাস্তবিক সে সকল আদৌ অপ্রামাণ্য বা অযৌক্তিক নহে। অতএব আপ্তবাক্য বিশ্বাস করা একান্ত কর্ত্তব্য। যেমন অ, আ, ক, খ, প্রভৃতিবর্ণের প্রতি বিশ্বাস না করিলে কেহ ভাষাবিজ্ঞানে অধিকারী হইতে পারে না, যেমন ১, ২, ৩ প্রভৃতি অঙ্কে বিশ্বাস না থাকিলে গণিতবিদ্যায় অধিকার হয় না, সেইরূপ আপ্তবাক্যে বিশ্বাস না থাকিলে কোন তত্ত্বজ্ঞানেই অধিকারী হওয়া যায় না। পরম পণ্ডিত নিউটন বলিয়াছিলেন (I am gathering pebbles on the sea-shore) "আমি সমুদ্রতীরে লোষ্ট্রসংগ্রহ করিতেছি মাত্র;" এবং মহাকবি কালিদাস বলিয়াছেন "তিতীর্ষুর্দুস্তরং মোহাদুড়ু-পেনাস্মি সাগরম্;" "আমি ভেলা দ্বারা সাগর পার হইবার ইচ্ছা করি-

তেছি।* মহাজন বাক্য অবলম্বনে সুপণ্ডিত হইয়াও সামান্য বিষয়ক জ্ঞান লাভে যত্নশীল মহাপণ্ডিতগণের যখন এইরূপ দুর্দ্দশা, তখন যে সে ব্যক্তির আদ্যোপান্ত নিজ বুদ্ধিবলে পরমতত্ত্ব আবিষ্কার করিতে যাওয়া কতদূর নির্বুদ্ধির কার্য্য? আজ কালি শিক্ষিত সমাজ পণ্ডিত বলিয়া যাঁহাদিগকে মনে করেন ও যাঁহাদিগের উপদেশ অনুসারে তাঁহারা সনাতন ধর্ম্ম ও চিরপ্রচলিত হিতকর রীতি নীতি সকল পরিত্যাগ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাঁহারা কোন কোন বিষয়ে বিজ্ঞ হইলেও প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী নহেন। যদিও দুই এক জন প্রকৃত তত্ত্বানুসন্ধায়ী থাকেন, তাঁহারা কেবলমাত্র পাশ্চাত্যবিদ্যারই অনুশীলন করেন, আর্য্যবিদ্যার কিছুমাত্র আলোচনা করেন না। এক্ষণে যে দুই এক জন আর্য্য বিজ্ঞানের অনুশীলন করিতেছেন, তাঁহারাও সংস্কারান্ধ। বাল্যকাল হইতে পাশ্চাত্য মতের আলোচনা করিয়া তাঁহাদের হৃদয় তন্ময় হইয়া পড়িয়াছে, সুতরাং আর্য্য ঋষিগণের অভিপ্রায় তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হওয়া কঠিন। এইজন্য উক্ত পণ্ডিত গণের মত একাদেশমাত্র-দর্শন-দোষে দূষিত। আবার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানানভিজ্ঞ দেশীয় পণ্ডিতগণ প্রাচীন তত্ত্বের যৌক্তিকতাদির বিষয় আদৌ আলেচানা করেন না, অনভিজ্ঞের ন্যায় শাস্ত্রবাক্যের বাহ্য অর্থেরই অনুবর্ত্তন করেন মাত্র। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যের প্রকৃত অভিপ্রায় বুঝাইয়া দিতে পারেন না। এইজন্য মহাজনের অভাবে, আপ্তবাক্য স্থির না হওয়াতেই আপ্তবাক্যের প্রতি মানবের এত অনাস্থা হইয়াছে।

সূক্ষ্মবুদ্ধি, উপযুক্ত অবস্থা, অবিচলিত অধ্যবসায়, দৃঢ় ঐকান্তিকতা ও সত্যানুরাগসম্পন্ন উচ্চাশয় ব্যক্তি উত্তমরূপ বিদ্যা শিক্ষা করিয়া একাগ্রচিত্তে দৃঢ় পরিশ্রম সহকারে পর্য্যবেক্ষণ রূপ তপশ্চার্য্যায় জীবন যাপন করিয়া যে বিষয়ে সম্যক অভিজ্ঞ হইয়াছেন, তাঁহার তদ্বিষয়ক বাক্যের নাম আপ্তবাক্য। কিন্তু তাঁহার বাল্যকালের বাক্য নয়, যৌবনকালের বাক্য নয়, বৃদ্ধকালের বাক্য—যখন (শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ) তিনি সহস্র ভ্রম সংশোধন করিয়া খাঁটি হইয়াছেন, যখন তাঁহার মিথ্যা বলিয়া স্বার্থসিদ্ধি করিবার আবশ্যকতা নাই—যখন নিজের কোন অভীষ্ট নাই—সেই প্রাচীন কালে, বহুকাল সাধিত দৃঢ় তপশ্চর্য্যাবলে জানিয়া, যাহা বলেন তাহা সত্য সত্যই আপ্তবাক্য—অভ্রান্ত সত্যবাক্য। এই সকল মহাপুরুষ-

দিগের বাক্য অবলম্বন করিয়া চলা সকলেরই আবশ্যক। তাহা বিজ্ঞান-সম্মত ও ঈশ্বরাভিপ্রেত। পরমেশ্বর মানবগণের রক্ষাবিধান জন্য মহাপুরুষের সৃষ্টি করিয়া অথবা স্বয়ং মহাপুরুষরূপে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া ঐ সকল তত্ত্ব প্রচারিত করিয়াছেন।

তবে যে কখনও কখনও আমরা মহাপুরুষবাক্যে ভ্রান্তি দেখিতে পাই, তাহার কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ, হয়ত যে সকল ব্যক্তিকে আমরা মহাপুরুষ বলিয়া জানিয়াছি, তাঁহারা প্রকৃত মহাপুরুষ নহেন, দ্বিতীয়তঃ আমরা অনেক সময়ে তাঁহাদের অভিপ্রায় বুঝিতে পারি না, তৃতীয়তঃ আমাদের বুদ্ধি ও সংস্কার দূষিত হওয়ায় সত্য আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন হইয়া যায়। এই জন্য গুরু আমাদের নিতান্ত আবশ্যক। যখন যে সন্দেহ উপস্থিত হইবে, গুরু তাহা নিরাকরণ করিবেন। ভ্রম দেখা যাহার তাহার কর্ম্ম নহে। বিজ্ঞান-বিদের ভুল বিজ্ঞানবিদ্ ভিন্ন বুঝিতে পারে না; সুতরাং কোন স্থানে মতদ্বৈধ দেখিলে আমাদের উপযুক্ত গুরুর উপদেশ গ্রহণ আবশ্যক। তাহা হইলেই কোন্‌টী ভ্রান্ত বাক্য তাহা বুঝিতে পারা যাইবে। সর্ব্বথা আপ্তবাক্যে বিশ্বাস করাইবার জন্যই পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভক্তিবৃত্তির সমাবেশ করিয়াছেন। আপ্তবাক্যবিশ্বাসে পরমোপকার লাভ হয় বলিয়াই ভক্তির এত মাহাত্ম্য এবং ভক্তই সাধক ও ধার্ম্মিকশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত হয়।

আশ্চর্য্য এই যে, আধুনিক শিক্ষিতগণ ভোগপরায়ণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত মিল, স্পেন্সর, কম্‌টি, প্রভৃতির বাক্য প্রামাণ্য বলিয়া গ্রহণ করেন, অথচ যে আর্য্য ঋষিগণ নিরত তপশ্চর্য্যায় জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, যাঁহারা ক্ষণেকের নিমিত্তও সুখের চেষ্টা করেন নাই, এক মনে এক ধ্যানে সত্য উপাসনার জন্য শরীরপাত করিয়াছেন, সেই আশক্তি শূন্য মহাপুরুষগণের বাক্য প্রামাণ্য মনে করেন না। এ জগতে তাঁহারাই ভোগপরাঙ্মুখ, স্বার্থশূন্য, পরহিতৈকব্রতী, সত্য ও ধর্ম্মজিজ্ঞাসু মহাপুরুষ। তাঁহারা অপরিসীম অধ্য-বসায় ও দৃঢ় তপস্যার বলে দিব্য বা বিজ্ঞানচক্ষু লাভ করিয়া তদ্দ্বারা পরমে-শ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়াছেন, তাঁহার আজ্ঞা সকল স্বকর্ণে শ্রবণ করিয়া-ছেন, মানবের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ জানিয়া মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া-ছেন; যাহা মনে আইসে তাহাই বলিয়া প্রতারণা করেন নাই। সেই মহা-পুরুষগণ প্রকৃত জগতের হিতকারী; তাঁহাদের বাক্যই প্রকৃত আপ্তবাক্য।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পুরুষকার।

সকল মনুষ্যই কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু সকলে সমানরূপ ফললাভ করিতে পারে না। কেহ কৃতকার্য্য ও কেহ অকৃতকার্য্য হয়। কেহ রাজা, কেহ পণ্ডিত, কেহ ধনী, কেহ বীর, কেহ সুখী হয়; এবং কেহ প্রজা, কেহ মূর্খ, কেহ নির্ধন, কেহ নিবীর্য্য, কেহ দুঃখী হয়। কিন্তু কেন এরূপ হয়? আধুনিক শিক্ষিতসম্প্রদায়ের মতে মানবের চেষ্টার ইতরবিশেষই ইহার একমাত্র কারণ। তাঁহাদের মতে চেষ্টাই কার্য্যের প্রধান কারণ—সুতরাং যে যেমন চেষ্টা করে সে সেইরূপ ফললাভ করে।

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, যদি চেষ্টা করিলেই কার্য্য হয়, তবে হয় না কেন? সকলেই ত চেষ্টা করিতেছে; তবে সকলেই ইচ্ছামত ধনী, পণ্ডিত, বীর ও সুখী হয় না কেন? ইহার উত্তরে পুরুষকারবাদী বলেন যে, যেরূপ চেষ্টা করিলে, কাঙ্ক্ষিত ফল লাভ হইতে পারে, সেরূপ চেষ্টা করে না বলিয়াই সকলের ফল লাভ হয় না। যদি তাঁহাদিগকে এমন সহস্র উদাহরণ দেখাইয়া দেওয়া যায় যে, কেহ সামান্য চেষ্টা করিয়া মহৎ ফল লাভ করিয়াছে ও কেহ বহুতর চেষ্টা করিয়াও সামান্য ফললাভ করিতে পারে নাই, তাহা হইলে তাঁহারা বলিবেন, যাহারা বহু চেষ্টা করিয়াও ফল পায় নাই, তাহাদের চেষ্টার পরিমাণ অধিক বটে, কিন্তু বুঝিতে না পারায় তাহাদের চেষ্টা ভ্রান্তি-সংকুল হইয়াছে, এবং যাহারা সামান্য বা বিনা চেষ্টায় ফললাভ করিয়াছে বোধ হইতেছে, তাহাদের চেষ্টার গভীরতা বুঝিতে পারা যায় নাই বলিয়া চেষ্টার অল্পতা বা নিশ্চেষ্টা বোধ হইয়াছে, বাস্তবিক তাহারা প্রকৃতরূপ চেষ্টা করিয়াছে। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি উত্তরাধিকার ক্রমে বা পোষ্যপুত্র স্বরূপে অতুল ধন পাইয়া যে ধনী হইয়াছে, তাহার ধনোপার্জ্জনের চেষ্টা কোথায়? সুরূপ ও সুকণ্ঠ প্রাপ্ত হইয়া যে লোকের প্রিয় হইয়াছে,

তাহার প্রিয় হইবার চেষ্টা কোথায়? ইংলণ্ডে জন্মিয়া যে স্বাধীন ও ভারতে জন্মিয়া যে পরাধীন হইয়াছে, তাহার স্বাধীন ও পরাধীন হইবার চেষ্টা কোথায়? হঠাৎ বজ্রাঘাতে যাহার মৃত্যু হইয়াছে, তাহার মৃত্যুর কারণ দুশ্চেষ্টা কোথায়? এরূপ শত সহস্র উদাহরণ দেখান যাইতে পারে, যে, সে সকলের উত্তরে পুরুষকারবাদীদিগের বাঙ্‌নিষ্পত্তি করিবারও শক্তি নাই। কিন্তু মানুষ এরূপ সংস্কারান্ধ যে, তথাপি বলিবে ঐ সকলের কারণ আজিও বুঝিতে পারা যায় নাই বটে, কিন্তু বিজ্ঞানের আলোচনা করিতে থাকিলে ক্রমে আমরা উহা বুঝিতে পারিব।

আধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায়ের দৃঢ় বিশ্বাস যে, পুরুষকারই কার্য্যের ফলাফলের একমাত্র বা মূল কারণ। তর্ক করিলে তাঁহারা অনেক সময়ে এ দিক ও দিক হেলেন বটে, কিন্তু কাহারও উন্নতি কি অবনতি দেখিলে বলিয়া থাকেন, তাহার চেষ্টা হইতেই উহা হইয়াছে, অর্থাৎ যে সুচেষ্টা করিয়াছে তাহারই উন্নতি হইয়াছে, আর যে সুচেষ্টা করে নাই, অর্থাৎ হয় আদৌ চেষ্টা করে নাই, অথবা যে চেষ্টা করিয়াছে তাহা অপর্য্যাপ্ত বা বিপরীত ভাবাপন্ন, তাহারই অবনতি হইয়াছে। য়ুরোপীয় দিগকে উন্নত ও ভারতীয় দিগকে অবনত দেখিয়া, তাঁহারা ঐ সংস্কার বশতঃ য়ুরোপীয় দিগের পুরুষকার ও কার্য্যপ্রণালীর প্রশংসা এবং ভারতীয়দিগের পুরুষকার ও কার্য্যপ্রণালীর নিন্দা করেন। কিন্তু হে পুরুষকারবাদিন্! আপনাকে জিজ্ঞাসা করি, কালিদাস ও সেক্ষপীয়র কবিতা লিখিতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, ভীষ্ম, অর্জ্জুন, বোনাপার্টি ও সেকন্দর বীর হইতে যেরূপ চেষ্টা করিয়াছিলেন, আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, কোপারনিকস্ ও নিউটন যেরূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব আবিষ্কার করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন, বুদ্ধ, চৈতন্য, খৃষ্ট যেরূপ ধর্ম্ম-তত্ত্ব বুঝিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন পৃথিবীতে আর কি কেহ সেরূপ চেষ্টা করে নাই? যদি না করিয়া থাকে, তবে কেন করে নাই? যখন সকলেরই সুখী ও যশস্বী হইবার ইচ্ছা আছে ও যখন তদুদ্দেশ্য সাধন জন্য সকলেই নিয়ত সাধ্যানুসারে পরিশ্রম করিতেছে, তখন কেন সুচেষ্টা করে না? বৃটন আজি বড় উন্নত, কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে উহারা পশুবৎ ছিল এবং ভারতীয়গণ এক্ষণে একান্ত পতিত কিন্তু দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে বিলক্ষণ উন্নত ছিল। ইহার কারণ কি? ইহারও উত্তরে কি আপনি

বলিবেন বৃটনেরা পূর্ব্বে চেষ্টা করে নাই, এক্ষণে চেষ্টা করিতেছে এবং ভারতীয়গণ পূর্ব্বে চেষ্টা করিত, এক্ষণে করে না? কিন্তু যাহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিত, তাহারা এক্ষণে চেষ্টা করে না কেন? এবং যাহারা পূর্ব্বে চেষ্টা করিত না, তাহারা এক্ষণে চেষ্টা করে কেন? ইহাতে কি স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে না যে, চেষ্টা কার্য্যের একমাত্র কারণ নহে?

মনুষ্যচেষ্টা মনুষ্যকৃত কার্য্যের একটী কারণ সত্য, কিন্তু উহা সম্পূর্ণ কারণ নয়, উহাকে মূল কারণও বলা যায় না। কেননা আমাদের কার্য্য সকল যদি কেবল মাত্র আমাদের চেষ্টা দ্বারা সম্পন্ন হইত, তাহা হইলেই মানবচেষ্টাকে মানবকৃত কার্য্যের একমাত্র কারণ বলা যাইত। কিন্তু তাহা যে হয় না, তাহা পূর্ব্বে একরূপ প্রতিপন্ন হইয়াছে। বাস্তবিক তাহা যদি হইত, তাহা হইলে মানব যাহা চেষ্টা করিত, তাহাই করিতে পারিত এবং প্রত্যেক মনুষ্যই, অন্ততঃ অধিকাংশ লোকে সমান ফল লাভ করিত। কিন্তু প্রত্যক্ষ দেখা যাইতেছে, তাহা হইতেছে না; প্রত্যুত অতি অল্প লোকেই চেষ্টার ফল লাভ করে। মানব ইচ্ছা করিয়া বা বুদ্ধিভ্রংশ বশতঃ চেষ্টা করে না বলিলে প্রকৃত উত্তর হয় না। কারণ চেষ্টাই যখন সিদ্ধির একমাত্র কারণ, তখন চেষ্টা দ্বারা ভ্রান্তি ও অনিচ্ছা দূর হওয়া উচিত। কিন্তু তাহা যখন হইতেছে না, তখন কখনই চেষ্টাকে একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে না। যদি বল চেষ্টা ভিন্ন কার্য্যসাধনের আরও কতকগুলি কারণ আছে বটে, কিন্তু সেগুলি অতি সামান্য, চেষ্টাই সর্ব্বপ্রধান, এই জন্য চেষ্টাকে মূল কারণ বলিতে হয়। আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত অসঙ্গত। কেন না যখন বলা হইতেছে, অন্যান্য কারণের অভাবে কার্য্য সম্পন্ন হয় না, তখন চেষ্টা মূল কারণ হইবে কি প্রকারে? মূল কারণ কাহাকে বলে? কারণাবলীর মধ্যে যে কারণের অভাবে কার্য্য আদৌ সম্পন্ন হয় না, তাহাকে মূল কারণ বলিব? অথবা কেবল মাত্র যে কারণবলে কার্য্য সম্পন্ন হয়, অন্য সহকারী কারণগুলি কেবল সৌন্দর্য্য সম্পাদন জন্য আবশ্যক, তাহাকে মূল কারণ বলিব? যদি মূল কারণের প্রথমোক্ত লক্ষণ ঠিক্ হয়, ও সেইজন্য মানব-চেষ্টাকে মূল কারণ বলিতে হয়, তবে অন্যান্য কারণ গুলিকেও মূল কারণ বলিতে হইবে। কেননা কেবল মাত্র চেষ্টায় যে, কোন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, অন্যান্য বহুতর কারণ সংযোগ আবশ্যক, ইহা

স্বীকারই করা হইয়াছে, সুতরাং যে সকল কারণের অভাবে কার্য্য অসম্পন্ন থাকে তৎসমস্তকেই মুল কারণ বলিতে হইবে। কিন্তু তাহা হইলে আর কারণের মূল ও সহকারী ভেদ থাকে না—কারণ মাত্রই মূল কারণ হইয়া পড়ে। যদি দ্বিতীয় লক্ষণকে মুল কারণের প্রকৃত লক্ষণ বলা যায়, তাহা হইলে মুল কারণ ও একমাত্র কারণের মধ্যে কিছুই প্রভেদ থাকে না। কেননা সহকারী কারণগুলি কার্য্যের কারণই নহে, সেগুলি সৌন্দর্য্য মাত্রেরই কারণ। উদাহরণ দ্বারা বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

বৃক্ষের কারণ বীজ। কেননা বীজ ভিন্ন বৃক্ষ হয় না। কিন্তু তাহা বলিয়া কি বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ বলা যাইতে পারে? যদি মৃত্তিকা, রস, তাপ, আলোক প্রভৃতির সহিত বীজ মিলিত না হয়, তাহা হইলে কি একমাত্র বীজ বৃক্ষ উৎপাদন করিতে সক্ষম হয়? তাহা যদি না হয়, তবে বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ কি প্রকারে বলিব? ঐরূপে বীজকে বৃক্ষের মূল কারণও বলা যাইতে পারে না। কেননা যদি বীজকে বৃক্ষের মূল কারণ বলিতে হয়, তবে মৃত্তিকা, জল প্রভৃতি যে সকল পদার্থের অভাবে বৃক্ষ জন্মিতে পারে না, তাহাদিগকেও মূল কারণ বলা উচিত। কিন্তু তাহা হইলে আর মুল কারণের প্রাধান্য থাকিল কৈ? তুমি অক্সিজনকে জলের মূল কারণ বলিবে? না হাইড্রোজনকে জলের মূল কারণ বলিবে? পীতবর্ণকে হরিৎ বর্ণের মূল কারণ বলিবে, না নীল বর্ণকে উহার মূল কারণ বলিবে? হিঙ্গুলের মূল কারণ পারদ না গন্ধক? পুত্রের মূল কারণ পুরুষ না স্ত্রী। অবশ্য তুমি ঐ সকল পদার্থের উৎপাদক কোনও একটী পদার্থকে মূল কারণ বলিতে পারিবে না। হয় উহাদের প্রত্যেক উপাদানকে মূল কারণ বলিতে হইবে, নয় উহাদের একটীকেও মূল কারণ বলিতে পারিবে না। কেননা ঐ সকল উপাদানাবলীর সমস্ত গুলির সংযোগ না হইলে পদার্থ উৎপন্ন হয় না। আবার যেমন তেমন ভাবে সংযুক্ত হইলেই অভিপ্রেত পদার্থ উৎপন্ন হয় না। অক্সিজন ও হাইড্রোজন মিলিত হইলেই জল হয় না, পারদ ও গন্ধক মিলিত হইলেই হিঙ্গুল জন্মে না। উপাদান পদার্থের পরিমাণ যথানিয়মিত হওয়া চাই এবং সংযোগ ক্রিয়া নির্দ্দিষ্ট মত হওয়া চাই, তবে যুক্ত পদার্থ উৎপন্ন হইবে। সুতরাং উপাদান পদার্থ সকল, তাহাদের যথাযোগ্য পরিমাণ, আবশ্যক মত

সংযোগক্রিয়া ও সংযোগ কার্য্যের কাল,—এই সমস্তের সমবায়কে উৎপন্ন পদার্থের কারণ বলিতে হইবে। ঐ সমবায়ই ঐ পদার্থের একমাত্র ও মূল কারণ। উহাদের কয়েকটীকে, কি একটী ভিন্ন সমস্তকে, একমাত্র বা মূল কারণ বলা যায় না। এক গাছি সূত্রকে বস্ত্র বলিলে যেরূপ ভুল বলা হয়, তাহাতে তদপেক্ষাও অধিক ভুল বলা হয়। তবে কি মূল কারণ শব্দের প্রয়োগ স্থল নাই? আছে। মনে কর এক মুষ্টি ধান্য, মুদ্গ, সর্ষপ, ও তিল প্রভৃতির বীজ এক স্থানে বপন করা হইল; মৃত্তিকা, জল, তাপাদি পদার্থ সকল বীজ সমান রূপ প্রাপ্ত হইল; তথাপি বিভিন্ন প্রকার বৃক্ষ বা তৃণ উৎপন্ন হইল। যদি জিজ্ঞাসা করা যায়, এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? তাহা হইলে বলিতে হইবে, বীজ বিভিন্নতাই ইহার একমাত্র বা মূল কারণ। সর্ষপ বৃক্ষ ও ধান্য বৃক্ষের যে প্রভেদ, তাহার মূল কারণ বীজের বিভিন্নতা।

বীজকে বৃক্ষের একমাত্র কারণ বলা যে কত অসঙ্গত, তাহা আর একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায়। বটবীজের পরিমাণ কত অল্প ও সুবৃহৎ বটবৃক্ষের পরিমাণই বা কত অধিক? যদি বীজই বৃক্ষের একমাত্র কারণ, তবে এক রতিরও কম পদার্থ কিরূপে সহস্রাধিক মণে পরিণত হইল? তিন্তিড়ীবীজে অম্লত্ব ও খর্জ্জুরবীজে স্বাদুতা কোথায় যে তিন্তিড়ী অম্ল ও খর্জ্জুর মিষ্ট হয়? সেগুণকাষ্ঠের শ্বেতবর্ণ ও দৃঢ়তা এবং শিশুকাষ্ঠের কৃষ্ণবর্ণ ও কঠিনত্ব কি বীজেই নিহিত আছে? বস্তুতঃ অতি ক্ষুদ্র বীজ যখন অতি বৃহৎ আয়তন বিশিষ্ট, নানা প্রকার আকার ও বর্ণবান, বহুবিধ আস্বাদ-সম্পন্ন এবং কঠিন, কোমল ও মসৃণ প্রভৃতি বহু গুণযুক্ত পদার্থ উৎপাদন করিতেছে, তখন কি প্রকারে বলিব, কেবল বীজই বৃক্ষের কারণ? প্রত্যুত ইহাই বলিতে হইবে যে, পৃথিবীস্থ বহুতর পদার্থ বীজ সহ মিলিত হইয়া ঐরূপ বহুগুণসম্পন্ন হয়। সুতরাং বীজের প্রাধান্য কোথায়? যখন হিঙ্গুল উৎপাদক পারদ ও গন্ধকের মধ্যে কাহারও প্রাধান্য দেওয়া যাইতে পারে না, তখন কি প্রকারে বীজ ও অন্য উপকরণ সকলের মধ্যে বীজের প্রাধান্য কল্পিত হইবে? যদি বল, যে, যখন দেখা যাইতেছে রসাদি এক-রূপ পদার্থ সর্ষপ ও বটবীজ রূপ ভিন্ন ভিন্ন পদার্থের মধ্যগত হওয়াতেই, সর্ষপ ও বটবৃক্ষরূপ ভিন্ন পদার্থ উৎপন্ন হইতেছে, তখন বীজের প্রাধান্য

নাই, বলা যায় কি প্রকারে? আমাদের বোধ হয় অভিনিবেশ সহকারে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অনায়াসে এ আপত্তি খণ্ডিত হইবে। কেননা যাহার সহিত যাহার যেরূপ রাসায়নিক সম্বন্ধ, সে পদার্থের যোগে সেইরূপ শক্তি বা কার্য্য প্রকাশ হইয়া থাকে। তাহাদের মধ্যে কোন একটীর প্রাধান্য নাই। নীল পীতের সহিত সংযোগে হরিৎ এবং রক্তবর্ণের সংযোগে পাটল বর্ণ হয়। হরিৎ ও পাটলবর্ণ উৎপন্ন হইবার উপাদান নীল উভয়েতেই আছে,—অপর উপকরণের মিল নাই। তাই বলিয়া কি পীতকে হরিতের ও রক্তকে পাটলের মূল কারণ বলিব? তাহা যদি বলা না যায়, তাহা হইলে, সর্ষপ ও বটবীজকেও সর্ষপ ও বট বৃক্ষের মূল কারণ বলা যাইতে পারে না। কেননা ঐ উভয়বিধ পদার্থেরই উৎপাদক স্বরূপে রসাদি নিয়ত বর্ত্তমান আছে, কেবল অপর উপকরণ বা বীজের প্রভেদ মাত্র। নীলের এমত শক্তি আছে যে, পীত যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহারা এরূপ ভাবে মিলিত হইবে যে, তাহাতে হরিৎ হইতেই হইবে, এবং যখন রক্ত তাহাতে মিলিত হইবে, তখন সে সংযোগে পাটল হইতেই হইবে। অথবা পীতের এরূপ শক্তি আছে যে, নীল যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন হরিৎবর্ণ হইবে এবং রক্তবর্ণের এরূপ শক্তি আছে যে, নীল যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন পাটলবর্ণ হইবে। ঐরূপ রসাদির এরূপ শক্তি আছে, সর্ষপ বীজ যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন সর্ষপ বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে এবং বটবীজ যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাকে বটবৃক্ষ হইতে হইবে। অথবা সর্ষপবীজের এমন শক্তি আছে, যে রসাদি যখন তাহার সহিত মিলিত হইবে, তখন তাহাতে সর্ষপ বৃক্ষ জন্মিবে এবং বটবীজের এমন শক্তি আছে যে, যখন রসাদি তাহাতে মিলিত হইবে, তখন বট বৃক্ষ জন্মিবে। সুতরাং বীজ বা রসাদি কিছুরই প্রাধান্য নাই। যদি কাহারও প্রাধান্য কল্পনা করিতে হয়, তবে সংযোগেরই প্রাধান্য বলিতে হইবে। কিন্তু সংযোগেরও বাস্তবিক প্রাধান্য নাই। কেন না আমরা দেখিতেছি সংযোগের প্রকার ভেদে যুক্ত পদার্থের সম্পূর্ণ ভিন্নতা হইতেছে। দুগ্ধের সহিত অম্ল সম্মিলনে দধি ও ছানারূপ দ্বিবিধ পদার্থ জন্মিতেছে। দধি ও ছানা আকার, আস্বাদন ও উপকারিতা বিষয়ে সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকার। এত বিভিন্ন যে, উহারা একই উপা-

দানে প্রস্তুত বলিয়া সহসা বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু বাস্তবিক উহাদের উপাদান সম্পূর্ণ এক। উভয় পদার্থই দুগ্ধ ও অম্ল সংযোগে উৎপন্ন। ঐরূপ এক প্রকার আম্র বীজ হইতে সুবৃহৎ ও সুস্বাদু ফজলী নেংড়া প্রভৃতি জন্মিতেছে, আবার অতি ক্ষুদ্র ও ভয়ানক টক আম্রও জন্মিতেছে। যখন একস্থানে একবিধ বীজ একই প্রকার যত্ন সহকারে রোপিত ও পালিত হইয়া উৎকৃষ্ট ও অপকৃষ্ট আম্রফল উৎপন্ন হইতেছে এবং একবিধ দুগ্ধ একবিধ অম্ল সংযোগে দধি ও ছানারূপ ভিন্নরূপ পদার্থে পরিণত হইতেছে, তখন কি প্রকারে বলিব যে, উপাদানপদার্থসকলের সংযোগ মাত্রই কার্য্যের কারণ? আমাদের বোধ হয় যে ইহাই বলা অসঙ্গত যে, যে পদার্থ যে পদার্থের সহিত যে পরিমাণে যেরূপ ভাবে সংযুক্ত হইলে যেরূপ পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারে, সেইরূপ হওয়াই সেই পদার্থ উৎপত্তির একমাত্র কারণ। উহার একটী বা একটী ভিন্ন সমস্তকে কারণ বলিলে সম্পূর্ণ ভ্রম হইবে। তবে তুমি বলিতে পার যে, রসাদি পদার্থের সহিত যোগে আম্রত্বের কারণ আম্র বীজ, বটত্বের কারণ বটবীজ ও সর্ষপত্বের কারণ সর্ষপবীজ। সর্ষপত্বের একমাত্র বা মূল কারণ সর্ষপবীজ ও বটত্বের একমাত্র বা মূল কারণ বটবীজ, এ কথা কখন বলিতে পার না।

যাহা আলোচনা করা গেল তাহাতে বুঝা গেল যে, যাহা উৎপন্ন হইতে যে যে পদার্থের যেরূপ সম্মিলন আবশ্যক, তাহার সংঘটনই তাহার কারণ, তাহার অসত্ত্বে তাহা হইতে পারে না। কি ভৌতিক পদার্থ, কি উদ্ভিদ্, কি কীট, কি পতঙ্গ, কি পশু, কি পক্ষী, কি মনুষ্য সকলের পক্ষেই ঐ এক নিয়ম। মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গাদির কারণ কেবল উহাদের বীজ বা শুক্র নহে। রসাদি অর্থাৎ শোণিতের যথানির্দ্দিষ্ট প্রকার মিলনই ঐ সকলের একমাত্র কারণ। সুতরাং যে জীব যেরূপ ভাবে যে কার্য্য সাধনক্ষম হইয়া উৎপন্ন, তাহা দ্বারা তদিতর কার্য্য সম্পন্ন হইতে পারে না! এই জন্য গুটীপোকা যেরূপ সূত্র নির্ম্মাণ ও লাক্ষাকীট যেরূপ লাক্ষা প্রস্তুত করিতে পারে, অন্যে তাহা পারে না। সিংহ ব্যাঘ্র যেরূপ পশু সংহার করিতে পারে, মেষ ছাগ সেরূপ পারে না। মানব যেরূপ বুদ্ধির কার্য্য করিতে পারে, অন্য জীবে তেমন পারে না। মেহগনির যেরূপ সুদৃঢ় কাষ্ঠ, সেগুণের সেরূপ হইতে পারে না, এবং সেগুণের কাষ্ঠের দ্বারা যেরূপ পোতাদি নির্ম্মিত হইতে

পারে, আম্রকাষ্ঠে সেরূপ হইতে পারে না। যে গাভী যে পরিমাণ দুগ্ধবতী হইয়া জন্মিয়াছে, তাহার অধিক দুগ্ধ দিবে না; যে মানব যেরূপ বুদ্ধি, বল, দৃঢ়তা প্রভৃতি, লইয়া জন্মিয়াছে, সে তাহার অতিরিক্ত কার্য্য করিতে পারে না।

পুরুষকারবাদী এক কথায় হয় ত এই সকল কথা উড়াইয়া দিবেন। তিনি বলিবেন, মানুষের সহিত কাহারও তুলনা হইতে পারে না—কেন না মানুষের চেষ্টা আছে, অপরের চেষ্টা নাই। এ কথা যদি বলা হয়, তাহা হইলে বোধ হয় তাঁহার ভ্রম হইয়াছে। কেন না চেষ্টা সকল জীবের ও সকল পদার্থেরই আছে। চেষ্টা ব্যতিরেকে কাহারই কোনও কার্য্যই সম্পন্ন হইতে পারে না। এ জগতে কোন্ জীব চেষ্টাশূন্য? সকল জন্তুই জীবিকা অর্জ্জন, বংশবিস্তার, জীবনরক্ষা ও বিশ্রামলাভ জন্য নিয়ত সচেষ্ট। সিংহ, ব্যাঘ্র যেরূপ প্রাণী হিংসা জন্য কৌশল অবলম্বন করে; ছাগ, মেষ সেইরূপ উদ্যানস্থ বৃক্ষলতাদি ভক্ষণ করিবার জন্য চতুরতা প্রকাশ করে, জীবিকা অর্জ্জন ও আত্মরক্ষা জন্য সামান্য কীটগণ যে কৌশল অবলম্বন করে, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মশক ও ছারপোকা মনুষ্যকে কষ্ট দিয়া যেরূপ কৌশলে মনুষ্যশোণিত পান করে, তাহা কি আশ্চর্য্যজনক নহে? মক্ষিকা-গণ নিয়ত মনুষ্যকে বিরক্ত করিতেছে, অথচ মনুষ্য অশেষ চেষ্টা করিয়াও তাহার কিছু প্রতীকার করিতে পারিতেছে না। এতদ্ভিন্ন বীবর, বাবুই, মধু-মক্ষিকা, পুত্তিকা প্রভৃতি জীবগণের চেষ্টায় কত প্রকার আশ্চর্য্য সুকৌশল-সম্পন্ন শিল্প সমূদ্ভূত হইতেছে। এই সমস্তকে যদি চেষ্টা না বলিতে হয়, তবে মানবচেষ্টাকে কিরূপে চেষ্টা বলিতে পারা যায়? মানবের চেষ্টা কি ঐ সকল হইতে ভিন্ন প্রকৃতির? কখনই নহে। কেন না মানবও অপর জীবগণের ন্যায় জীবিকা অর্জ্জন, বংশবিস্তার, বিশ্রাম-সুখ-সম্ভোগ ও প্রাণরক্ষার জন্য চেষ্টা করে। ভক্তি, শ্রদ্ধা দয়া, প্রভৃতি কতকগুলি অন্যজীবাতিরিক্ত গুণ মানবের আছে বটে, কিন্তু তাহাতে সাধারণ নিয়মের ব্যত্যয় হইবার কারণ কিছুই নাই। কেননা সকল জীব সকলপ্রকার চেষ্টা করে না, যে জীবের যেরূপ চেষ্টা প্রাকৃতিক, সে জীব সেই রূপই চেষ্টা করে। আহার জন্য ব্যাঘ্রও চেষ্টা করে, মেষও চেষ্টা করে; কিন্তু মেষ কি ব্যাঘ্রের অনুবর্ত্তন করিতে পারে, না ব্যাঘ্র মেষের অনুবর্ত্তন করিতে পারে? কাকাতুয়া, টীয়া, ময়না,

প্রভৃতি পক্ষী যেরূপ মনুষ্যের ন্যায় বাক্য উচ্চারণ করিতে পারে, কাক কোকিল কি তাহা পারে? হস্তী, অশ্ব, গো ও কুকুর প্রভৃতি প্রাণিগণ যেরূপ মনুষ্যের অধীনতা স্বীকার করিয়া প্রভূত উপকার সাধন করে, সিংহ ব্যাঘ্র প্রভৃতিরা কি সেরূপ করে? কখনই না; সকলেরই চেষ্টা প্রকৃতির অনুযায়িনী। মানবও ঐরূপ যে প্রকৃতি লইয়া জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, সেই প্রকৃতি অনুসারে চেষ্টা করে। কি মানব কি অন্যান্য প্রাণী প্রকৃতি বা শক্তির অতিরিক্ত চেষ্টা করিয়া কেহই কৃতকার্য্যতা লাভ করিতে পারে না। সুতরাং কেবল মানবের চেষ্টা আছে, অন্য জীবের নাই, একথা নিতান্ত অসঙ্গত। তাহা যদি হইল, তবে কেবল মানবের চেষ্টা দ্বারা বিশ্বনিয়মের ব্যভিচার হইবে কেন? যদি হয়, তবে সকল জীবের চেষ্টা দ্বারাই হইবে। তাহা হইলে মেষের চেষ্টায় সিংহের কার্য্য হইবে, সিংহের চেষ্টায় বানরের কার্য্য হইবে এবং বানরের চেষ্টায় মানবের কার্য্য হইবে। তাহা না হইয়া, যদি কেবল মানবের চেষ্টাতেই দেবতার কার্য্য হয় বলা যায়, তাহা হইলে মানবচেষ্টাকে কুহকিনী সর্ব্বসাধনী শক্তি বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে হয় এবং তাহা হইলে মানবের কিছুই অসাধ্য থাকে না। কিন্তু তাহা হইলে মানব চেষ্টা করিলে মৃত্তিকাকে স্বর্ণ করিতে পারিত, অগ্নিকে জল ও জলকে অগ্নি করিতে পারিত, এবং জীবকে অজীব ও অজীবকে জীব করিতে পারিত। বাস্তবিক মানব কি তাহা পারে? কখনই না।

যখন মানব বুদ্ধিবলে নানাবিধ অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সম্পাদন করিতেছেন অর্থাৎ যখন মানব এক দিনের পথ এক ঘণ্টায় যাইতেছেন, মুহূর্ত্ত মধ্যে এক মাসের পথ হইতে সংবাদ আনিতেছেন, এক দিনে সহস্র বস্ত্র বয়ন ও অযুত পুস্তক মুদ্রণ করিতেছেন, শত যোজন ব্যবধানে থাকিয়াও পরস্পর কথাবার্ত্তা কহিতেছেন, বিহঙ্গমগণসহ সুখে আকাশমার্গে ভ্রমণ করিতেছেন এবং জলকে বাষ্প, ও বাষ্পকে জল করিতেছেন, তখন মানব চেষ্টা করিলে যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন না কেন, একথা যাঁহারা বলেন তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কেন না মানব শিক্ষাবলেই ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, আপনার সর্ব্বসাধনী শক্তির বলে নহে, অর্থাৎ যে যে পদার্থের যেরূপ সংযোগে যে কার্য্য সম্পন্ন করা মানবের সাধ্যায়ত্ত, তাহা পরিজ্ঞাত হইয়াই মানব তদনুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করে; চেষ্টা দ্বারা কোন পদার্থের কোন নূতন শক্তি

সৃষ্টি করিতে পারে না। তাহা যদি পারিত, তাহা হইলে পারদের সহিত গন্ধকের সম্মিলনে যেমন হিঙ্গুল প্রস্তুত করিয়া থাকে সীসক সংযোগেও সেইরূপ করিতে পারিত; অম্লজানের সহিত জলজান সংযোগ না করিয়া যবক্ষারজান সংযোগ করিয়া জল প্রস্তুত করিতে পারিত; তাড়িত সংযোগ না করিয়া জল বা অগ্নি সংযোগে তাড়িতবার্ত্তাবহ প্রস্তুত করিতে পারিত। কিন্তু তাহা কি কেহ পারে? অবশ্য কখনই না।

ইচ্ছানুরূপ কার্য্য সম্পন্ন করা দূরে থাকুক, সকল সময়ে মানব শক্তি ও চেষ্টার মিলন করিতেই সমর্থ হয় না। কেননা কার্য্য সম্পাদনের কারণ অনেক। কোন কার্য্য সম্পাদন করিতে হইলে কারণ সমুদয়ের মিলন আবশ্যক। সকল কারণ বা সকল উপাদানের সম্মিলন ব্যতীত কোন কার্য্যই সম্পন্ন হয় না। মনে কর, তোমার এমন বুদ্ধি আছে, যে, সেই বুদ্ধিবলে তুমি একজন জগন্মান্য পণ্ডিত হইতে পার। কিন্তু তোমার ধন নাই, কিংবা তুমি চিররোগী অথবা তুমি এমন স্থানে বাস করিতেছ, যেখানে বিদ্যার কিছুমাত্র আদর নাই—শিখিবারও কোন উপায় নাই; তুমি কিরূপে পণ্ডিত হইবে? তোমার যন্ত্র নির্ম্মাণের বুদ্ধি কৌশল বিলক্ষণ আছে, কিন্তু তন্নির্ম্মাণে যে সকল উপাদানের আবশ্যক, তৎসংগ্রহের সামর্থ্য তোমার কিছু মাত্র নাই; তুমি কিরূপে আত্ম-শক্তি প্রকাশ করিবে? তুমি সচ্চরিত্র সাধু, কিন্তু তুমি এমন জঘন্য প্রতিবেশিগণে দ্বারা বেষ্টিত, যে তোমার সদনুষ্ঠানসকল নিয়ত বিপরীত ফল প্রসব করিতেছে; তুমি কিরূপে সাধু হইবে? তুমি বিদ্যাবুদ্ধি সম্পন্ন,—চেষ্টা করিলে তুমি বিলক্ষণ সুখী হইতে পার; কিন্তু তোমার পরিবারবর্গ, তোমার আত্মীয় স্বজন, স্বতঃ পরতঃ তোমার প্রতিকূল হওয়ায় তোমার সকল চেষ্টাই বিফল হইতেছে। তুমি দূরদেশে উপার্জ্জনের জন্য যাইবে—কিন্তু তোমার বৃদ্ধা মাতার পীড়া হইল, যাওয়া হইল না; যেমন তাহা আরাম হইল, অমনি তোমার ভ্রাতা দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন, বাটীতে অন্য কেহ অভিভাবক নাই দেখিয়া তুমি যাইতে পারিলে না; যেমন তাহার কোন সুযোগ করিলে, অমনি একজন প্রতিবেশী তোমার নামে একটী মিথ্যা মকদ্দমা করিল। এই প্রকারে ঘটনাবলী প্রতিপদে তোমার কার্য্যের বিঘ্ন জন্মাইয়া দিয়া তোমাকে নিরাশ ও অবশেষে বিপদ্‌গ্রস্ত করিল।

আবার দেখ, মহারাণী স্বর্ণময়ীর স্বামীর পূর্ব্ব পুরুষ, একজন ইংরেজ গবর্ণরকে আশ্রয় দিয়া কত সম্পত্তি প্রাপ্ত হইলেন। কিন্তু যদি মুসলমান-রাজ ঐ গবর্ণরকে বিপদ্‌গ্রস্ত না করিতেন, এবং যদি গবর্ণর তাঁহারই গৃহে উপস্থিত না হইয়া অন্য কাহারও গৃহে উপস্থিত হইতেন, তাহা হইলে ত রামকান্ত আশ্রয়দানের অবসর পাইতেন না, এরূপ সৌভাগ্যশালীও হইতে পারিতেন না। এ প্রকার অবসর অন্যের ঘটিলে সেও কি এইরূপ লাভবান্ হইত না? অবশ্য হইত। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, কত কাপুরুষ রাজা নির্ব্বিবাদে ভারতে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, কিন্তু পৃথ্বীরাজের ন্যায় প্রবল পরাক্রান্ত বীর, রাজ্যচ্যুত ও হত হইলেন। সে সময়ে ছলনাতৎপর, বিশ্বাসঘাতক যবন যদি ভারতে আসিয়া প্রবেশ না করিত, তাহা হইলে তাঁহার কি সে দশা ঘটিত? প্রতাপ সিংহ যেরূপ পরাক্রমশালী তেজস্বী ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহার সময়ে যদি আকবরের ন্যায় সম্রাট্ ভারতে না থাকিতেন, তাহা হইলে কি তিনি ভারতেশ্বর হইতে পারিতেন না? কিন্তু ভারতেশ্বর হওয়া দূরে থাকুক, তিনি আপনার রাজ্যেরও উদ্ধার সাধন করিতে পারিলেন না; অথচ অনেক দেশে ও অনেক সময়ে তাঁহা অপেক্ষা হীনতেজা ব্যক্তিগণ দিগ্বিজয়ী হইয়াছেন। নিউটন, আর্য্যভট্ট, কালিদাস, সেক্সপিয়র, বুদ্ধ, ঈশা, অর্জ্জুন, বোনাপার্টি প্রভৃতির ন্যায় শক্তি লইয়া যে আর কেহ জন্মগ্রহণ করেন নাই, তাহা নহে। বোধ হয় অনেক লোক তাঁহাদের অপেক্ষাও অধিক শক্তিসম্পন্ন ছিলেন। কিন্তু শক্তির সহিত যে সকল কারণপরম্পরার সমবায় আবশ্যক, তাহা না হওয়াতেই তদ্রূপ বা তদধিক শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। মনে কর, আর্য্যভট্ট যে সময়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহার দুই শত বৎসর পূর্ব্বে তদপেক্ষা অধিক শক্তিসম্পন্ন অনেক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্যভট্ট যাহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহা আবিষ্কার হওয়ার পূর্ব্বে যে সকল তত্ত্ব অবগত হওয়া আবশ্যক, তাহা তখন আবিষ্কৃত হয় নাই বলিয়া, তাঁহারা কিছু করিতে পারেন নাই। ঐ আর্য্যভট্ট কিংবা ভাস্করাচার্য্য যদি এখন জন্ম পরিগ্রহ করিতেন, তাহা হইলে তাঁহারা আধুনিক যন্ত্র সমূহ ও নবাবিষ্কৃত জ্যোতিস্তত্ত্ব সকলের সহায়ে যে কত উন্নতি করিতে পারিতেন, তাহার ইয়ত্তা কি? এইরূপে অনুসন্ধান

করিলে জানা যায়, যে, উপযোগী অবস্থা, অনুকূল ঘটনা ও যথাযোগ্য কাল কার্য্যসাধনের অতি আবশ্যক উপাদান। সচরাচর এই গুলি অদৃষ্ট নামে অভিহিত হইয়া থাকে। শস্য উৎপন্ন করিবার জন্ম যেমন ভূমির উর্ব্বরতা, কর্ষণের আধিক্য, পরিমিত বর্ষণ, আলোকাদির প্রাচুর্য্য, পুষ্ট বীজ ও বপন যোগ্য কাল প্রভৃতি বহুতর উপাদানের আবশ্যক, কার্য্য মাত্রেরই সেইরূপ; অর্থাৎ যে কার্য্যসাধন করিতে হইলে যে যে উপাদান আবশ্যক, তৎসমস্তের যথাযোগ্য পরিমাণের উপর কার্য্যের সফলতা নির্ভর করে। যদি তৎসমস্তের সম্মিলন না হয়, তবে সহস্র চেষ্টা করিলেও কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারা যায় না। কিন্তু উপযোগী কাল ও অবস্থা এবং অনুকূল ঘটনার সমাবেশ যখন চেষ্টার অতীত তখন মানবের চেষ্টায় কিছুই হয় না বলিতে হইবে অর্থাৎ মানব কেবল মাত্র স্বচেষ্টায় অতি সামান্য কার্য্যও সম্পাদন করিতে পারে না।

তার্কিক হয় ত বলিবেন, তবে কি মানবের কিছুই করিতে হইবে না? বিনা চেষ্টাতে আপনা হইতেই ফল লাভ হইবে? আপনিই ভাত মুখে উঠিবে? না পড়িয়া লোকে পণ্ডিত হইবে? না, তাহা কখনই হইবে না। কেন না চেষ্টা চেষ্টিত কার্য্যের কারণ বা উপকরণ মধ্যে পরিগণিত। সুতরাং অন্য উপকরণ বিশেষের অভাবে যেমন কার্য্য সম্পন্ন হয় না, চেষ্টার অভাবেও সেইরূপ চেষ্টিত কার্য্য সুসম্পন্ন হইতে পারে না। তাই কবিবর মাঘ বলিয়াছেনঃ—

"নালম্বতে দৈষ্টিকতাং
ন নিষীদতি পৌরুষে।
শব্দার্থৌ সৎকবিরিব
দ্বয়ং বিদ্বানপেক্ষতে॥"

শিশুপাল বধ ২য় সর্গ ৮৬।

সৎ কবি যেমন শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখেন, পণ্ডিত সেইরূপ দৈব ও পুরুষকার উভয়ই অবলম্বন করেন। অর্থাৎ অর্থের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল শব্দাড়ম্বর করিলে অথবা শব্দসৌন্দর্য্যের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল অর্থের প্রতি দৃষ্টি করিলে যেমন উত্তম রচনা হয় না—ফলতঃ উত্তম শ্লোক রচনা করিতে হইলে শব্দ ও অর্থ উভয়ের প্রতি দৃষ্টি রাখা আবশ্যক,

—সেইরূপ কার্য্য সম্পাদন সময়ে কেবল মাত্র দৈব বা কেবল মাত্র পুরুষকারের উপর নির্ভর করিলে তাহা সুসম্পন্ন হইবে না। ঐ উভয়ের প্রতি নির্ভর করিতে পারিলেই চেষ্টিত কার্য্যের ফললাভ হইতে পারে।

তাই বলিয়া কেহ যেন মনে করেন না যে, চেষ্টা মানবের ইচ্ছায়ত্ত বা স্বযত্নোৎপাদিত। কেন না যদি মানবের ঐ সকল চেষ্টাকে মানবের নিজস্ব বলিতে হয় তাহা হইলে পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃষ, ছাগ প্রভৃতির বৃদ্ধি, ভোজন, গমন প্রভৃতি চেষ্টাকেও তাহাদের নিজস্ব বলিতে হইবে। তাহা হইলে জলের স্রোত, বায়ুর বেগ, অগ্নির দাহন, চুম্বকের লৌহাকর্ষণ প্রভৃতিকেও তাহাদের স্বোপার্জ্জিত শক্তি বলিতে হইবে। সেকন্দর সাহের বীরত্ব যদি সেকন্দরেরই স্বচেষ্টাসম্ভূত বল, তবে ১২৭১ সালের আশ্বিন মাসের প্রবল বাত্যা, এট্না পর্ব্বতের প্রবল অগ্ন্যুৎপাত, হিমালয়ের উচ্চতা, সিংহের পশুরাজত্ব প্রভৃতিকে কেন তাহাদের স্বচেষ্টাসম্ভূত বলিবে না? মানব! যখন তোমার জন্ম লাভ হয় নাই, তখন তুমি কি আপনার জন্মলাভের জন্য চেষ্টা করিয়াছ? তোমার জন্মলাভ কি সেই চেষ্টার ফল সম্ভূত? না তোমার উচ্চ কুলে, উৎকৃষ্ট প্রদেশে ও ধনি-গৃহে উদ্ভব এবং প্রবল বুদ্ধিমত্তা প্রভৃতি স্বাভাবিক গুণাবলী তোমার সেই চেষ্টার ফলসম্ভূত। এ প্রশ্ন আমরা হিন্দুকে জিজ্ঞাসা করিতেছি না, কেন না হিন্দু পূর্ব্ব জন্ম ও আপনার অকিঞ্চিৎকারিতা স্বীকার করেন। যাঁহারা পূর্ব্ব জন্ম স্বীকার করেন না, তাঁহাদের প্রতিই আমাদের এই প্রশ্ন। বাস্তবিক কাহারও চেষ্টা স্বোপার্জ্জিত নহে। যাহার যে চেষ্টা অপ্রাকৃতিক সে সেরূপ চেষ্টা করিতে পারে না। যাহা স্বচেষ্টালব্ধ বলিয়া আমরা গর্ব্ব করি তাহা বাস্তবিক স্বচেষ্টালব্ধ হইলে আমি যেমন কবি বা বুদ্ধিমান বলিয়া গর্ব্ব করিতে পারি, নেংড়া আঁবও সেইরূপ সুস্বাদুতার জন্য আপনার ক্ষমতার গর্ব্ব করিতে পারে। অতএব জন্ম, মৃত্যু, স্থিতি, চেষ্টা কিছুই মানবের স্বচেষ্টা লব্ধ নহে।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

ঈশ্বর।

যতদূর আলোচনা করা গেল, তাহাতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, কি জড় কি অজড়, কি ইতর প্রাণী কি মনুষ্য, কেহই আপন চেষ্টায় কিছু করিতে পারে না, এবং কেহই নিজে আপন আপন শক্তি অর্জন করে নাই। অগ্নির দাহিকাশক্তি, জলের দ্রবত্ব, চুম্বকের লৌহাকর্ষণশক্তি, সিংহের হিংসা, ছাগের নিরীহতা, কাকাতুয়ার বাক্‌পটুতা, মানুষের ভাষাজ্ঞতা, কিছুই কাহারও স্বোপার্জ্জিত নহে। কিন্তু তবে এ সমস্ত কিরূপে কোথা হইতে উদ্ভূত হইল? কি প্রকারে পদার্থ সকল পরস্পর মিলিত ও সংযুক্ত হইয়া নবগুণসম্পন্ন হয়? হাইড্রোজন ও অক্‌সিজন কি আপন আপন চেষ্টায় মিলিত হইয়া জলরূপে পরিণত হয়? তাহা কখনই হইতে পারে না; যদৃচ্ছাক্রমে মিলিত হইলেই বা তাদের মিলনে জলরূপ নূতন পদার্থ হইবে কি প্রকারে? শুক্র ও শোণিত যে, যদৃচ্ছাক্রমে মিলিত হয় না, প্রবল আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া পরস্পর মিলিত হয়, তাহা ত স্পষ্টই প্রত্যক্ষ হই তেছে। অতএব কে উহাদিগকে মিলাইবার জন্য পরস্পরকে আকর্ষণ করিবার চেষ্টা প্রদান করিল? এবং কেই বা তাহাদের সংযোগে নূতন পদার্থ উদ্ভবের শক্তি প্রদান করিল? কে পদার্থ সকলকে বিবিধ গুণসম্পন্ন করিল? এবং কেই বা ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ ও ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীকে ভিন্ন ভিন্ন রূপ কার্য্যে যত্নশীল করিল? অবশ্যই বলিতে হইবে, এই সকলের মূল প্রস্রবণ আছে— অবশ্যই বলিতে হইবে এমন কোন পদার্থ, শক্তি বা ব্যক্তিবিশেষ আছেন তাঁহাহইতেই ঐ সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইতেছে। সেই মূল শক্তিই ঈশ্বর-পদবাচ্য। সুতরাং ঈশ্বর বিজ্ঞানের অবিষয় নহেন। প্রত্যুতঃ ঈশ্বরের নাস্তিত্বই বিজ্ঞানবিরুদ্ধ। সেই জন্য সকল দেশের ও সকল কালের লোকেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। যাঁহারা নাস্তিক নামে পরিচিত,

তাঁহারাও প্রকৃত প্রস্তাবে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন। তাঁহাদের ব্যবহৃত প্রকৃতি, শক্তি, ফোর্স (Force) স্বভাব, নেচর (Nature) প্রভৃতি শব্দ ঈশ্বরেরই প্রতিপাদক। আস্তিক যাঁহাকে ব্রহ্ম বলেন, নাস্তিক তাঁহাকেই স্বভাব বলেন। কেন না নাস্তিক যখন বলিতেছেন পদার্থ ও জীবগণ কেহই আপন ইচ্ছায় বা স্বশক্তিবলে জন্মগ্রহণ করে না, আপন ইচ্ছায় বা স্বশক্তিতে শক্তিলাভ করে না ও আপন ইচ্ছায় বা স্বশক্তিবলে ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সকলেই প্রাকৃতিক বা স্বভাবকৃত নিয়মানুসারে উৎপন্ন, শক্তিসম্পন্ন ও মৃত হয়, তখন স্বভাব শব্দ যে ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক তাহাতে আর সন্দেহ কি ? যে শক্তি সমগ্র শক্তির মূল, ব্রহ্ম ও প্রকৃতি উভয় শব্দ তাহারই দ্যোতক হইতেছে। অথবা যে শক্তিবলে পদার্থ ও জীবগণের শক্তির উৎপাদন ও ধ্বংস সাধন হয়, ঐ উভয় শব্দ দ্বারা তাহাই বুঝাইতেছে। নাস্তিকেরা ভিন্ন নাম ব্যবহার করেন বলিয়া যদি অন্যরূপ ভাবিতে হয় তবে ত অগ্নি, অনল ও ফায়ারকে (Fire)এক পদার্থ বলা যাইতে পারে না। বাস্তবিক নামভেদে কিছু আইসে যায় না ; নাম মানবেরই দেওয়া। অন্যান্য সমস্ত পদার্থ যেমন ভিন্ন ভিন্ন বহু নামে প্রথিত, ঈশ্বরও সেইরূপ ব্রহ্ম, ঈশ্বর, প্রকৃতি পুরুষ, গড্ (God) হরি, দুর্গা প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ফলতঃ যখন নাস্তিকেরা বলেন আমরা নিসর্গেরই সম্পূর্ণ অধীন, তখন আর নাস্তিক ঈশ্বর স্বীকার করিলেন না কৈ ? স্পষ্টই ত ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিলেন। অতএব ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করিবার জন্য আমাদিগকে অধিক প্রয়াস পাইতে হইবে না। কি আস্তিক কি নাস্তিক সকলেই সমস্বরে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া থাকেন। কি বিজ্ঞান, কি কল্পনা সমস্তই নিঃসংশয়ে ঈশ্বর স্বীকার করে। শক্তিদাতা ঈশ্বর নাই অথচ একান্ত শক্তিহীন আমরা আছি, একথা কেবল বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে, যথেচ্ছাসম্ভূত কল্পনারও একান্ত বিরুদ্ধ। তাই আস্তিক নাস্তিক সকলেই একবাক্যে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিয়া থাকেন।

তবে কি নাস্তিকদিগকে আমরা নাস্তিক বলিব না ? না, নাস্তিকদিগের পদবী অনুসরণ করিলে আমরা কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারিব ? অবশ্য তাহা কখনই নহে, নাস্তিকেরা নাস্তিক নামেই অভিহিত হইবেন। কেন না ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধে নাস্তিকদিগের সহিত আস্তিকগণের অত্যন্ত মতভেদ। স্বরূপ সম্বন্ধে আস্তিকগণের মধ্যেও সম্প্রদায়গত মত ভেদ আছে বটে, কিন্ত

নাস্তিকগণের সহিত যে মতভেদ সে একান্ত বিপরীত। অধিক কি নাস্তিকগণের কৃত লক্ষণবিশিষ্ট ঈশ্বরকে ঈশ্বর বলিয়াই বুঝিতে পারা যায় না। নাস্তিকেরা যে ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করেন, তিনি বুদ্ধিধর্ম্মসম্পন্ন (Rational Being) নহেন, বিশ্ব ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করিবারও তাঁহার কিছু মাত্র শক্তি নাই, কাযেই তাঁহার উপাসনারও কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই। সুতরাং বাক্যে তাঁহারা ঈশ্বরের সত্তা স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ তাঁহার সত্তা স্বীকার করেন না। কেবল মাত্র ঈশ্বর আছেন ইহা স্বীকার করিলেই আস্তিক হয় না। যাঁহারা আত্মশক্তির প্রাধান্য স্বীকার করেন তাঁহারাই প্রকৃত নাস্তিক ও যাঁহারা ঈশ্বরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করেন তাঁহারাই প্রকৃত আস্তিক। তাই হিন্দুশাস্ত্রের মতে, যাহাদের পরকালে বিশ্বাস নাই তাহারা নাস্তিক। তাই বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিলেও পরকালে বিশ্বাস করায় আস্তিক নামে অভিহিত। নাস্তিকগণের মত এই যে মূল প্রকৃতি (ঈশ্বর) তাপতাড়িতাদির ন্যায় অন্ধ শক্তিবিশেষ মাত্র, সুতরাং তাপতাড়িতাদির ন্যায় মূল শক্তির চেতনসুলভ কোন প্রকার বুদ্ধি, ইচ্ছা, দয়া বা জ্ঞানাদি কিছুই নাই। যে যুক্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহারা এই মীমাংসায় উপনীত হইয়াছেন, সঙ্ক্ষেপে তাহা বিবৃত হইতেছে।

নাস্তিকগণ বলেন, যদি ঈশ্বর অর্থাৎ যে শক্তিবলে এই বিশ্বকার্য্য চলিতেছে তাহা, বুদ্ধিসম্পন্ন (Rational) হইতেন, তাহা হইলে কখনই এ জগতে ঈদৃশ দুঃখ ও বৈষম্য থাকিত না। যদি ঈশ্বরের দয়া ও সর্ব্বপ্রকার শক্তি থাকিত, তাহা হইলে জীবগণ কখনই ঈদৃশ দুঃখ ভোগ করিত না। তাহা হইলে তিনি দুঃখের সৃষ্টিই করিতেন না। যখন প্রমাণিত হইয়াছে কিছুই স্বয়ং উৎপন্ন নহে, ও কোন পদার্থেরই স্বশক্তি কিছুই নাই, তখন অবশ্য বলিতে হইবে দুঃখও স্বয়ং উৎপন্ন নহে, ঈশ্বরই দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা। কিন্তু কেন তিনি দুঃখের সৃষ্টি করিয়া জীবগণকে কষ্ট দিতেছেন? জীবগণ কোন্ দোষে দোষী? কোনও প্রাণীরই যখন স্বশক্তি কিছুই নাই, তখন ত কেহই আপন দুঃখের কারণ হইতে পারে না। যদি বল ঈশ্বর কার্য্য বিশেষের সুখ দুঃখ রূপ ভিন্ন ভিন্ন ফল নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়া জীবগণকে তদবলম্বনে স্বাধীনতা দিয়াছেন, মানব যেমন কার্য্য করে সেইরূপ ফলভোগ করে, তাহা হইলে প্রকৃত উত্তর হইল না। কেন না তিনি যখন স্বাধীনতা

দিলেন তখন কি জন্য মানবকে কুপথে যাইবার প্রবৃত্তি দিলেন? যে কুপ্রবৃত্তির বলে মানব দুঃখদায়ক কার্য্যে রত হয় তাহা ত তাহার স্বোপার্জ্জিত নহে। ঈশ্বর সে কুপ্রবৃত্তি না দিলে কি কখনও একান্ত শক্তি-হীন মানব কুকার্য্য করিতে পারিত? কখনই না। যদি আমাদিগকে সুখী করিতে তাঁহার বাস্তবিক ইচ্ছা থাকিত, তাহা হইলে আমরা কিছুতেই সে ইচ্ছার অন্যথা করিতে পারিতাম না। আমাদের এমন কি শক্তি আছে যে আমরা তাঁহার ইচ্ছা ও চেষ্টার অন্যথাচরণ করিব? যে দুষ্প্রবৃত্তির বলে আমরা প্রাপ্ত স্বাধীনতার অপব্যবহার করি, তাহা ত তাঁহারই প্রদত্ত। যদি পূর্ব্ব জন্মের কার্য্যকে সুখদুঃখের কারণ বল, তাহাও সঙ্গত নহে; কেন না সর্ব্ব প্রথম জন্মে কুকর্ম্ম করিলাম কেন? প্রথম জন্মে যে অন্যায় কার্য্য করিলাম, তাহা ত আর পূর্ব্ব জন্মের ফলে হইয়াছে বলিতে পারা যায় না। যদি বল দুঃখ ও দুষ্প্রবৃত্তি আদি ঈশ্বরের সৃষ্ট নয়—কু-পদার্থ তিনি সৃষ্টি করেন নাই, যাহা ভাল তাহাই তাঁহার সৃষ্ট, তাহা হইলে যে যুক্তিবলে ঈশ্বরের সত্তা প্রমাণিত হইল, সেই মূল যুক্তিই খণ্ডিত হইয়া যায়। কেন না তাহা হইলে কু-পদার্থ সকলের ন্যায় আমরা ও অন্য পদার্থ সকলও তাঁহার সৃষ্ট নয় বলিতে পারা যায়, সুতরাং ঈশ্বরের সত্তাই সপ্রমাণ হয় না। অতএব স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে ঈশ্বরই জীবগণকে অযথা দুঃখ প্রদান করিতেছেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, তিনি সকলকে সমান দুঃখ দেন না, কেহ অল্প দুঃখী, কেহ অতিশয় দুঃখী। কিন্তু কি জন্য তিনি সংসারকে এরূপ বিষমাবস্থ করিলেন? কি জন্য কেহ রাজা কেহ প্রজা, কেহ বলবান কেহ দুর্ব্বল, কেহ ধনী কেহ নির্ধন, কেহ রূপবান্ কেহ কদাকার, কেহ মনুষ্য কেহ কীট হইয়াছে? কেন তিনি সকলকে সমান করেন নাই? সুতরাং ঈশ্বরকে ন্যায়পরায়ণ দয়ালু বা বুদ্ধিমান্ বলা যাইতে পারে না। প্রত্যুত তাঁহাকে নির্দ্দয় পক্ষপাতপরায়ণ ও বিবেকবিহীন বলিতে হয়। অথবা বলিতে হয় তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন নহেন। বাস্তবিক ঈশ্বর বুদ্ধিমান ও শক্তিসম্পন্ন হইলেও আমাদের সম্বন্ধে তিনি একান্ত অক্ষম। কেননা বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে সপ্রমাণ হইয়াছে, বিশ্বব্যাপার নির্দ্দিষ্ট নিয়মে চলিতেছে, অর্থাৎ সেই পরম শক্তি, যে কার্য্য করিলে যেরূপ ফল হইবার নিয়ম করিয়াছেন তৎসম্পন্ন হইলে সে ফল ফলিবেই ফলিবে অর্থাৎ

স্বাভাবিক নিয়মানুসারে যে ঘটনার যে পরিণাম নির্দ্দিষ্ট রহিয়াছে, তাহা ঘটিতেই হইবে, কিছুতেই তাহার অন্যথা হইবে না। ঈশ্বর নিজেও তাহার অন্যথাচরণ করিতে পারেন না। সুতরাং আমরা অন্যায়াচরণজনিত দুঃখে নিপীড়িত হইয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইলে, তিনি আমাদের দুঃখ দূর করিতে পারেন না। তিনি কৃত নিয়মের অধীন হইয়া যখন স্বাধীনতাশূন্য ও নূতন শক্তি প্রকাশে অক্ষম হইয়াছেন, তখন ভক্তের মনোরথ পূর্ণ করিবার শক্তি তাঁহার কোথায়? সুতরাং ঈশ্বরোপাসনার কোন আবশ্যকতাই নাই। যখন ঈশ্বরের উপাসনায় কোন ফল নাই ও যখন তিনি আমাদের কোন হিত বা অহিত করিতে পারেন না, তখন ঈশ্বর আছেন কি না তাহা জানারও আমাদের কোন প্রয়োজন নাই; তৎকৃত নিয়ম বা বিজ্ঞানশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলেই আমাদের প্রয়োজন সম্পন্ন হয়। যখন আমাদের কার্য্যের সহিত তাঁহার কোন সম্বন্ধই নাই, তখন তাঁহার থাকা না থাকা উভয়ই তুল্য। অথবা আমাদের সম্বন্ধে তিনি নাই বা মৃত।

ভালরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে, নাস্তিকদিগের এই সকল যুক্তি নিতান্ত অসার ও একান্ত বিজ্ঞানবিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইবে। এক একটী করিয়া আমরা ঐ সকলের বৈজ্ঞানিক আলোচনা করিতেছি।

যিনি এই অশেষ কৌশলময় বিশ্বের মূল, যিনি বুদ্ধিসম্পন্ন জীবগণের সৃষ্টিকর্ত্তা তিনি বুদ্ধিসম্পন্ন নহেন, এ কথা কি নিতান্ত অসার নয়? আমরা বুদ্ধিমান আর আমাদের বুদ্ধিদাতা বুদ্ধিমান নহে? একথা কি মনেও স্থান লাভ করিতে পারে? যাহার যে শক্তি নাই সে পদার্থ হইতে যে তদ্রূপ শক্তিমান পদার্থ সমুদ্ভূত হইতে পারে তাহার বৈজ্ঞানিক যুক্তিসিদ্ধ কি প্রমাণ আছে? যদি বল স্পষ্টই দেখা যাইতেছে চূর্ণ ও হরিদ্রা ইহার কিছুতেই রক্তবর্ণ নাই অথচ যখন উহাদের যোগে রক্তবর্ণ হইতেছে, তখন বুদ্ধিহীন মূল শক্তি হইতে বুদ্ধিসম্পন্ন জীবের সমুদ্ভব অসম্ভব কেন? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে চূর্ণ ও হরিদ্রা উভয় পদার্থেই রক্তবর্ণের উপাদান আছে। যে যে পদার্থের যোগে রক্তবর্ণ জন্মে তাহার কোন উপাদান চূর্ণে ও কোন উপাদান হরিদ্রায় আছে, যেমন ঐ উপাদান দ্বয় মিলিত হয় অমনি রক্তবর্ণ পরিদৃষ্ট হয়। কেননা তাহা না হইলে জল ও চূর্ণ, কর্দ্দম ও হরিদ্রা অথবা যে কোন পদার্থদ্বয় মিলিত হইলেই

তাহাদের যোগে রক্তবর্ণ হইত। যদি বল বুদ্ধির উৎপত্তিও ঐরূপ অর্থাৎ যে যে শক্তিসমাবেশে বুদ্ধি জন্মে সেই সেই শক্তির এক একটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থে বিভক্ত হইয়া আছে, আমাদের দেহে তাহাদের সংযোগ হইয়াছে বলিয়াই বুদ্ধি প্রকাশিত হইয়াছে; মূল উপাদানে বুদ্ধির উপাদান মাত্র আছে কিন্তু বুদ্ধি নাই। কিন্তু তাহা হইলে বিশ্বের মূল উপাদান এক হইতে পারে না, তাহাহইলে বহুতর মূল উপাদান স্বীকার করিতে হয়—অনেক শক্তি—অনেক ঈশ্বর মানিতে হয়।

যদি তাহাই স্বীকার করা যায় অর্থাৎ যদি স্বীকার করা যায় যে মূলশক্তি বহুবিধ ও তাহাদের এক একটীতে বুদ্ধি প্রভৃতি চেতনাসুলভ গুণের এক একটী উপাদান আছে এবং তাহাদের সম্মিলনে বুদ্ধি প্রভৃতি উদ্ভূত হয়, তাহা হইলেও ঐ মূল শক্তি গুলিকে সম্পূর্ণ স্বাধীন ও পরস্পর সম্বন্ধশূন্য বলিতে পারা যায় না। কেননা যদি মূলশক্তিগুলি স্বাধীন হয়, তবে তাহাদের পরস্পরের মিলন যদৃচ্ছালব্ধ ভিন্ন হইতে পারে না। কিন্তু তবে কি প্রকারে তাহাদের নিয়ত নিয়মানুযায়ী সম্মিলন হইতেছে এবং তাহাদের সংযোগে অপূর্ব্ব পদার্থের উৎপত্তিই বা কি প্রকারে হইতেছে? অর্থাৎ যে যে মূল শক্তিগুলিতে বুদ্ধির উপাদান আছে তাহাদের পরস্পরের যথানিয়মে মিলনই বা কিপ্রকারে হইতেছে এবং তাহাদের মিলনে বুদ্ধিরূপ সম্পূর্ণ নূতন শক্তিই বা জন্মিতেছে কি প্রকারে? ভিন্ন ভিন্ন শক্তিগুলি যখন পরস্পর সম্বন্ধশূন্য ও স্বাধীন, তখন মিলনে তাহাদের আদৌ ইচ্ছা না জন্মিতে পারে, ইচ্ছা জন্মিলেও সে মিলন এরূপ নিয়মানুযায়ী হইতে পারে না। সেই স্বেচ্ছাজাত মিলন কখনও দিনের মধ্যে দশবার ঘটিতে পারে, কখনও বা শত বৎসর মধ্যে একবারও না ঘটিতে পারে। পরন্তু তাহারা যখনই মিলিত হয়, তাহাদের সে মিলনে নূতন যৌগিক পদার্থ উৎপন্ন হইতে পারেই না। কেননা তাহা হইলে তাহাদের কিছুমাত্র স্বাধীনতা থাকিল না, সংযোগমাত্রেই তাহাদের ভিন্ন পরিণতি হইল। সুতরাং বহু শক্তি স্বীকার করিতে হইলে তৎসঙ্গে অন্ততঃ এ কথাটি স্বীকার করিতে হইবে যে, এমত একটী ভিন্ন শক্তি আছে যে, সে নিয়ত ঐ সকল শক্তির সংযোগ সাধন ও তাহাদের সংযোগে নব শক্তির উদ্ভব করিয়া দিতেছে। কিন্তু তাহা হইলে ঐ সকল শক্তিকে সেই সংযোগবিধায়িনী

শক্তির সম্পূর্ণ অধীন বলিতে হইবে, নচেৎ তাহারা কেন নিয়ত তাহার আজ্ঞাধীন থাকিবে? কিন্তু তাহা হইলে আর তাহাদিগকে মূলশক্তি বলা যাইতে পারে না। সুতরাং একের অধিক মূলশক্তি থাকিতেই পারে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিদ্‌গণ অম্লকর, জলকর, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি কতকগুলি ভৌতিক পদার্থ এবং তাপ, তাড়িত, আলোক প্রভৃতি কতকগুলি মৌলিক শক্তির অস্তিত্ব স্বীকার করেন বটে, কিন্তু কোন্ পদার্থের যে কোন্ শক্তি স্বকীয় তাহা কিছু বলিতে পারেন না, প্রত্যুত তাঁহারা বলেন, তাপ, তাড়িত প্রভৃতি কতকগুলি শক্তি সকল পদার্থেরই সাধারণ। তাঁহাদের মতে তাপতাড়িতাদিশূন্য পদার্থ পৃথিবীতে নাই। অতএব অম্লকরাদি সকল পদার্থেই যখন তাপাদি নির্দ্দিষ্ট শক্তি বর্ত্তমান রহিয়াছে তখন তাহারা কোন মতেই সর্ব্বাবয়বে ভিন্ন নহে, সুতরাং তাহারা মূলপদার্থও নহে। ঐরূপ নিগূঢ় গবেষণা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, তাপ, তাড়িত, আলোক প্রভৃতি শক্তিসকলও মৌলিক শক্তি নহে। প্রাচীন পণ্ডিতেরা আকাশকেই মহাভূত বলেন। তাঁহাদের মতে সেই আকাশ হইতেই তাপ, তাড়িত, আলোক, জল, স্থল প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছে। বস্তুতঃ বহু মূল শক্তি বৈজ্ঞানিক যুক্তির একান্ত বিরুদ্ধ। অতএব বুদ্ধিবিধাতা ঈশ্বর (মূলশক্তি) বুদ্ধিহীন একথা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। যদি তিনি বৈষম্য ও দুঃখের সৃষ্টি করিয়া জীবগণকে বৃথা কষ্ট দিতেছেন একথা সত্য হয়, তাহাহইলে তাঁহাকে নিষ্ঠুর ও অত্যাচারী বলিতে পারা যায়, কিন্তু কোন মতে বুদ্ধিহীন বলা যায় না।

বাস্তবিক পরমেশ্বর নিষ্ঠুর বা অত্যাচারী বলিয়া বৈষম্য ও দুঃখ বিধান করেন নাই। বৈষম্য ভিন্ন সৃষ্টিই হইতে পারে না এবং দুঃখ ভিন্ন সুখই হইতে পারে না। তাই বৈষম্য ও দুঃখের অস্তিত্ব। যদি সৃষ্টিই না হইল ও সুখই না হইল, তবে তুমি আমিই বা কোথায়, তোমার আমার সুখই বা কোথায়! তুমি যে তোমাকে ও তোমার সুখকে সারপদার্থ বিবেচনা কর, বৈষম্য ও দুঃখ না থাকিলে যে, সেই তুমি ও সেই সুখ কিছুরই সত্তা থাকিত না। বৈষম্য না হইলে সৃষ্টি হয় না—ভেদই সৃষ্টি। যদি সকল মানব সমান হয়, যদি সকল জীব সমান হয়, যদি সকল পদার্থ সমান হয় এবং যদি সকলে সমান সুখী হয়, তাহা হইলে একই প্রকারমাত্র পদার্থে বিশ্বপূর্ণ থাকে, এবং সে পদার্থের কোন প্রকার চেষ্টাই থাকে না। বুদ্ধি, দয়া, শ্রদ্ধা, চেষ্টা

প্রভৃতি কোন কার্য্যের ও কোন মনোবৃত্তিরই অস্তিত্ব থাকে না। মনে কর সকল মানবই সমান শক্তি সম্পন্ন, কেহ রাজা কেহ প্রজা নহে, কেহ বলবান কেহ দুর্ব্বল নহে, কেহ ধনী কেহ নির্ধন নহে, সকলেই সমান শক্তিসম্পন্ন ও সমান সুখী। তাহা হইলে মানব কুলে সাম্যবিধান হয় বটে, কিন্তু পশ্বাদি ইতর প্রাণী ও মানবে ভেদ থাকে; সুতরাং তাহা হইলেও বৈষম্য ঘুচে না। প্রকৃত সাম্য সংস্থাপন করিতে হইলে পশু, পক্ষী, কীট পতঙ্গ, বৃক্ষ লতা ও যাবতীয় জড় পদার্থকে ঐরূপ মানব করা আবশ্যক। কিন্তু তাহা হইলে এই বিশ্ব কেবল মানবরূপ একইপ্রকার পদার্থ মাত্রে পরিপূর্ণ হইল। সেই পদার্থ বা সমগ্র মানবমণ্ডলী একইরূপ শক্তি সম্পন্ন হওয়ায় কাহারও প্রাধান্য লাভের লালসা বা দুঃখ নিবারণের চেষ্টা থাকে না। দয়া, শ্রদ্ধা, প্রেম, প্রীতি প্রভৃতি মনোবৃত্তির পরিচালনা বা হস্ত পদাদি শারীরিক কোন অঙ্গের চালনা করিবার আবশ্যক হয় না। যে সকল লক্ষণ থাকায় মানব, মানব বা জীবপদ বাচ্য হয়, তাহার কোন লক্ষণই সে মানবে থাকে না, বিশ্ব কেবল মানবাকার প্রস্তরমূর্ত্তি সমূহের সমষ্টিতে পরিপূর্ণ থাকে। তাহাদের অবস্থিত হইবার স্থানও থাকে না, কেন না স্থান যদি মনুষ্য ভিন্ন অন্য কিছু হয় তাহা হইলেই বৈষম্য রহিল। উক্তরূপ লক্ষণবিশিষ্ট মানব যেমন দুঃখবিহীন সেইরূপ সুখস্পর্শশূন্য। ঐরূপ মানবে ও আকাশে কিছুই ভেদ নাই, উক্তরূপ সৃষ্টি ও ধ্বংসের কিছুমাত্র ভেদ নাই। বাস্তবিক দুঃখ ও বৈষম্য না থাকিলে কোন প্রকার অভাব নিবারণের আবশ্যকতা থাকে না, সুতরাং তন্নিবারণের কোন চেষ্টাই জন্মে না। যত চেষ্টা সমস্তই দুঃখ নিবারণ ও উন্নতি লাভ করিবার জন্য। ক্ষুধাদুঃখ নিবারণ জন্য ভোজনচেষ্টা, কামরিপু জনিত দুঃখ দূর করিবার জন্য স্ত্রীসম্ভোগচেষ্টা, শীতকষ্ট নিবারণ জন্য বস্ত্রলাভচেষ্টা, তাপাদির কষ্ট নিবারণ জন্য গৃহচেষ্টা, এবং বড় লোক হইবার জন্য নানা চেষ্টার আবশ্যক। পুত্রস্নেহ, দাম্পত্যপ্রেম, পিতৃমাতৃভক্তি, গুরুজনশ্রদ্ধা প্রভৃতি আন্তরিক বৃত্তিগুলির চালনার আবশ্যকতাও দুঃখ ও বৈষম্য নিবারণ জন্য। অভাব না থাকিলে কাহার সহিত কাহারও কোন প্রকার আকর্ষণই থাকে না। সুতরাং সমস্ত বিশ্বই গতিহীন হয়। আবার গতি না থাকিলে তাপ জন্মে না; বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করিয়াছেন চেষ্টাজনিত কম্পনই তাপ উৎপাদনের হেতু। তাপ না থাকিলে এক

মুহূর্ত্তও বিশ্ব অবস্থিত হইতে পারে না। বৈজ্ঞানিকেরা বলেন যে মুহূর্ত্তে সকল পদার্থ নিশ্চেষ্ট হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই জগৎ অন্ধকারময় ও তাপশূন্য হইয়া, ধ্বংস প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং সাম্য ধ্বংসের এবং বৈষম্য সৃষ্টির মূল প্রাণ। অতএব আপনার অস্তিত্ব প্রার্থনীয় হইলে বৈষম্যকেই মঙ্গল বিধায়ক বলিতে হইবে।

দুঃখ বাস্তবিক দুঃখ নয়। কেন না দুঃখ না থাকিলে, সুখের উপলব্ধিই হয় না। যেমন তিক্ত না থাকিলে মিষ্টের মিষ্টত্ব অনুভূত হয় না, সেইরূপ দুঃখ না থাকিলে সুখের আস্বাদই অনুভূত হইত না। ক্ষুধায় যদি দুঃখ না হইত, তাহা হইলে আহারে কখনও সুখ হইত না, রৌদ্র যদি কষ্ট না দিত, তবে ছায়া কখনও সুখকর হইত না, যদি দারিদ্রে দুঃখ না থাকিত, তাহা হইলে ধনী হইলে সুখ হইত না, যদি মূর্খ হওয়া দুঃখজনক না হইত, তাহা হইলে বিদ্যালাভে কেহ সুখী হইত না, যদি নিন্দায় কষ্ট না হইত, তবে প্রশংসায় কাহারও আনন্দ হইত না। যদি কুটীরবাসে দুঃখ না থাকিত, তবে অট্টালিকা-বাস জন্য সুখলাভ হইত না, যদি পরাধীনতা জন্য দুঃখ না থাকিত, তবে স্বাধীনতাসুখে সুখী হইতে পারিতাম না, যদি পাপের ভীষণ মূর্ত্তি না দেখিতাম, তবে ধর্ম্মের মূর্ত্তিকে সৌম্য বলিয়া বোধ হইত না, বাস্তবিক দুঃখ ও সুখ চিরসম্বদ্ধ। একের অভাবে অন্যের অস্তিত্বই থাকে না। যেমন তাপ ও হিমের এবং আলোক ও অন্ধকারের চিরসম্বন্ধ, দুঃখ ও সুখেরও সেইরূপ চিরসম্বন্ধ। যেমন যাহাতে যত তাপ কম সে পদার্থ তত শীতল ও যাহাতে যত তাপ অধিক তাহা তত উষ্ণ বলিয়া কথিত হয়, সেইরূপ যাহাতে যত দুঃখভাগ অল্প, তাহাকে তত সুখকর ও যাহাতে যত দুঃখ ভাগ অধিক, তাহাকে তত দুঃখকর বলে। এককালীন তাপশূন্য পদার্থ যেমন জগতে নাই, সেইরূপ এককালীন দুঃখ শূন্য অবস্থা এ পৃথিবীতে নাই—হইতেও পারে না। যেমন তাপের স্পর্শজ্ঞানলাভ না হইলে হিমের স্পর্শ বুঝা যায় না এবং হিমের স্পর্শজ্ঞান না হইলে তাপ অনুভূত হয় না, সেইরূপ দুঃখের অনুভব না হইলে সুখ বোধ হয় না এবং সুখ বোধ না হইলে, দুঃখেরও উপলব্ধি হয় না। ক্রমাগত তাপ বা হিম যেমন অসহ্য, ক্রমাগত দুঃখ বা সুখ সেইরূপ অসহ্য। সুখের পর দুঃখ ও দুঃখের পর সুখ হইলেই মানব প্রকৃত সুখী হইতে পারে। তাই এ জগতে কাহারও ভাগ্যে

ক্রমাগত সুখ বা ক্রমাগত দুঃখ দেখিতে পাওয়া যায় না। "চক্রবৎ পরিবর্ত্তন্তে দুঃখানি চ সুখানি চ" কি মহারাজ চক্রবর্ত্তী, কি অশেষশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত, কি বহুধনধান্যসম্পন্ন ধনী কেহই নিয়ত সুখী নহেন এবং কি গৃহশূন্য দরিদ্র, কি চিররোগযন্ত্রণাভোগী রোগী, কি অকালকুষ্মাণ্ড মূর্খ কেহই নিয়ত দুঃখভোগ করে না। সকলেই পর্য্যায় ক্রমে সুখ ও দুঃখভাগী। স্থূল চক্ষে দেখিলে কাহাকেও অধিক দুঃখী ও কাহাকে অধিক সুখী মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। জ্ঞানচক্ষে দেখিলে দেখিতে পাইবে, সকলেই সমান সুখী। শূকর ও ইন্দ্র, কুটীরবাসী দরিদ্র ও মহারাজ চক্রবর্ত্তী, সকলেই সমান সুখী।

দুই পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণ জল রাখিয়া একটীকে অল্পোষ্ণ ও অন্যটীকে অধিক উষ্ণ করিয়া, প্রথমে যদি অল্প উষ্ণ জলে হাত দেওয়া যায়, তাহা হইলে তাহা উষ্ণ বোধ হইবে। পরে ঐ হাত তুলিয়া যদি অধিক উষ্ণ জলে দেওয়া যায় তাহা হইলে তাহা অধিকতর উষ্ণ বোধ হইবে, কিন্তু তাহার পরে যদি আবার ঐ অল্পোষ্ণ জলে হস্ত প্রদান করা যায় তাহা হইলে সে জল আর উষ্ণ বোধ হইবে না, প্রত্যুতঃ তাহা সুখস্পর্শ বা শীতল বোধ হইবে। সুতরাং বলিতে হইতেছে যাহা উষ্ণ তাহাই শীতল এবং যাহা শীতল তাহাই উষ্ণ। সুখ দুঃখ সম্বন্ধেও ঐরূপ। যাহা একবার দুঃখ বলিয়া বোধ হইয়াছিল, তাহাই আবার সুখকর বোধ হয়। যে জল গ্রীষ্মকালে সুখস্পর্শ শীতকালে তাহা নিতান্ত তীব্র, যে অগ্নি শীতকালে সুখসেব্য গ্রীষ্মকালে তাহা একান্ত অসহ্য, নিদাঘকালে যে বৃষ্টিপাত নিতান্ত প্রার্থনীয়, বর্ষাকালে তাহা একান্ত বিরক্তিকর হয়। যে মিষ্টান্ন ক্ষুধার সময় উপাদেয় খাদ্য বিবেচনা হয় উদরপূর্ত্তি বা রোগের সময়ে তাহা নিতান্ত বিস্বাদ বোধ হয়। সুখ দুঃখের এই চমৎকার সম্বন্ধ বুঝিতে পারিলে দুঃখকে দুঃখময় বলিতে পারা যায় না, প্রত্যুতঃ তাহাকে সুখেরই হেতু বলিতে হয়। সূক্ষ্মরূপ বিবেচনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায়, সুখের উপকরণ অপেক্ষা দুঃখ দূর করিবার উপকরণ হইতে মানব অধিক সুখভোগ করে, অর্থাৎ সুখকর পদার্থের সম্ভোগে মানবের যে সুখলাভ হয়, তাহা অপেক্ষা দুঃখ দূর করিয়া যে সুখলাভ হয় তাহাই অধিক প্রীতিকর ও অধিক সময়ভোগ্য। এ পৃথিবীতে সুখের উপকরণ কয়টী? সুগন্ধ পুষ্পের আঘ্রাণ, মনোহর সঙ্গীত শ্রবণ, সুস্বাদু

ভক্ষ্য আস্বাদন, শোভাময় পদার্থ দর্শন, ও সুখস্পর্শ দ্রব্যের স্পর্শে সুখলাভ হয় বটে, কিন্তু তাহা তত তৃপ্তিকর নহে, নিয়ত সুপ্রাপ্যও নহে। দুঃখাবসানে যে সুখ হয়, তাহা সমধিক তৃপ্তিকর ও সর্ব্বদা উপভোগ্য। ক্ষুধার সময় শাকান্ন যেরূপ মধুর লাগে, ক্ষুধা না থাকিলে পলান্ন সেরূপ মিষ্ট লাগে না। বিরহ বা আকাঙ্ক্ষার সময় কুৎসিত রমণীর স্পর্শ যেরূপ সুখকর, অনাবশ্যক সময়ে অযত্নপ্রাপ্ত পরমরূপলাবণ্যবতী রমণীস্পর্শ সেরূপ সুখ-কর নহে। শীতে কম্পিত হইয়া কম্বল গায়ে দিলে যে সুখ পাওয়া যায়, বিনা শীতে উৎকৃষ্ট কাশ্মীরশাল সে সুখ দিতে পারে না। শ্রমের পর ভূমি শয্যায় যেরূপ নিদ্রাসুখ অনুভব হয়, ইচ্ছামাত্র করিয়া দুগ্ধফেননিভ-শয্যায় সে নিদ্রাসুখলাভ হয় না। কোন প্রকার শোকপ্রাপ্তি সময়ে আধ্যা-ত্মিক উপদেশ বাক্য যত সুমধুর বোধ হয়, নিত্যলব্ধ সেই উপদেশ সেরূপ মধুর হওয়া দূরে থাকুক তাহা হৃদয়ে স্থানই প্রাপ্ত হয় না। অধিক কি মানব যেরূপ ধীরতা সহকারে দুঃখ ভোগ করে সেরূপ ধীরতা সহকারে সুখ ভোগ করিতে পারে না। কেননা পীড়িত স্বামী পুত্রের সেবা করিয়া রমণী ক্লান্ত হয় না, ধনোপার্জ্জন জন্য দিবারাত্রি কষ্ট করিয়াও কেহ ক্লান্ত হয় না। কিন্তু সুখলাভের জন্য পলান্ন ভোজন, সঙ্গীত শ্রবণ, চন্দনাদির অনুলেপন, কোমল শয্যায় শয়ন, সুগন্ধের আঘ্রাণ প্রভৃতি সুখ সম্ভোগ করিয়া অল্পক্ষণ মধ্যেই মানব বিরক্ত হইয়া পড়ে। কতক্ষণ আতর সুঁকিতে পারা যায়? গান শুনিতে শুনিতে কে না ঘুমাইয়া পড়ে? বাস্তবিক সাধের সুখ অপেক্ষা দুঃখজাত বা দুঃখার্ত্তের সুখ বড়ই প্রীতিকর।

দূর হইতে দুঃখকে যেরূপ ভয়ঙ্কর ও সুখকে যেরূপ প্রীতিকর বলিয়া বোধ হয়, নিকটে আসিলে আর সেরূপ বোধ হয় না। যিনি মনে করেন, যথেষ্ট ধন পাইলে সুখী হইব, তিনি যখন সেই ধনের অধিকারী হয়েন, তখন তিনি বুঝিতে পারেন, বাস্তবিক তিনি সুখী হয়েন নাই। মনে করা যায় বিবাহ করিলে সুখী হইব, কিন্তু শেষে বিবাহকে বড় যাতনাদায়ক বন্ধন বলিয়া বোধ হয়। মনে করা যায়, পুত্র হইলে সুখ হইবে, কিন্তু শেষে পুত্র অশেষ কষ্টের কারণ হইয়া উঠে। মনে করা যায়, যদি আহারের চিন্তা না থাকে, তবে পাশকাদি ক্রীড়া, গীত বাদ্য শ্রবণ প্রভৃতি আমোদকর কার্য্য করিয়া সুখী হইব, কিন্তু সে অবস্থায় উপনীত হইলে, তাহা বড়ই কষ্টকর

বোধ হয়। মনে হয়, সুরম্য প্রাসাদ, সুদর্শন পরিচ্ছদ, সুকোমল শয্যা ও সুভোজ্য ভক্ষ্য নিয়ত পাইলে সুখী হইতে পারিব, কিন্তু কিছুদিন ঐ সকল উপভোগ করিলে তাহাতে আর কিছুমাত্র রুচি থাকে না। বাস্তবিক দূর হইতে যে অবস্থাকেই সুখের বিবেচনা করা যায়, সেই অবস্থায় উপনীত হইলে আর কেহ তাহাকে সুখকর বিবেচনা করেন না। তাই সকলেই নিয়ত অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইবার ইচ্ছা করেন, কিছুতেই কাহারও আকাঙ্ক্ষা পূরিত হয় না, নিয়তই আকাঙ্ক্ষা বাড়িতে থাকে। যদি কাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রকৃতই সুখকর হইত, তাহা হইলে কখনই এরূপে আকাঙ্ক্ষা বাড়িত না, প্রত্যুত কাঙ্ক্ষিত বিষয় প্রাপ্তিমাত্র মানব তৃপ্ত হইত। কিন্তু বিষয় ভোগ করিয়া কি কেহ তৃপ্ত হইয়াছেন? কাহারও কি আকাঙ্ক্ষা মিটিয়াছে? কখনই না; কেহই মনে করেন না যে আমি সুখী হইয়াছি। দুঃখের অবস্থাও ঐরূপ অর্থাৎ দূর হইতে যে অবস্থাকে বড় ক্লেশকর বলিয়া বোধ হয়, সে অবস্থায় পতিত হইলে আর সে দুঃখ থাকে না। পুত্রশোকাদি দুর্ব্বিষহ শোকেরও সাম্য হয়। যিনি বহুকালস্থায়ী কোন রোগে আক্রান্ত হয়েন ও তজ্জন্য নানাবিধ সুরস খাদ্য ও আমোদকর রাত্রিজাগরণাদি ত্যাগ করিতে বাধ্য হয়েন, প্রথমে তাঁহার কিছু কষ্ট বোধ হইলেও শেষে তাহাতে আর সে কষ্ট থাকে না। যে খাদ্য তাঁহার অপকারক তাহা অতি সুস্বাদু হইলেও তাহা খাইতে তাঁহার আর ইচ্ছামাত্রও হয় না; কাহারও অন্যায় জিদে যদি তিনি কখনও তাহা খাইতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাহা তাঁহার ভালই লাগে না। প্রথমে ভাবা যায় কি প্রকারে পর্ণগৃহে বাস করিব, কি প্রকারে অল্প মূল্যের বস্ত্র পরিধান করিব, কি প্রকারে ঘৃতদুগ্ধহীন খাদ্য ভোজন করিব, কি প্রকারে সামান্য শয্যায় শয়ন করিব, কিন্তু কিছুদিন অভ্যাস করিলে সে সকল আর কিছুমাত্র কষ্টদায়ক বোধ হয় না। তখন সামান্য উপকরণে উত্তম আহার হয় ও সামান্য শয্যায় প্রগাঢ় নিদ্রা হয়। পীড়া হইলে ভাবা যায় কি প্রকারে এ কষ্ট সহ্য করিব, কিন্তু কিছুদিন সহ্য করিলে অতি যন্ত্রণাদায়ক রোগও তাদৃশ কষ্টপ্রদান করে না! শ্বাসকাশ, বাত প্রভৃতি অত্যন্ত যন্ত্রণা-দায়করোগে আক্রান্তদিগকে দেখিয়া আমরা মনে করি, ইহারা কি প্রকারে এই অসহ্য কষ্ট সহ্য করিতেছে, আমি কখনই উহা সহ্য করিতে পারি না। কিন্তু জগদীশ্বরের এমনই আশ্চর্য্য কৌশল যে, ঐ সকল রোগে আক্রান্ত

হইলে তাহা আর সেরূপ ভয়ানক বোধ হয় না। অভ্যাসের সুশীতল ক্রোড়ে লালিত হইয়া ও আশার মোহিনীমূর্ত্তি দর্শন করিয়া সকল প্রকার দুঃখীই শান্তিলাভ করে। 'পতিতঃ পর্ব্বতো লঘুঃ' এ প্রবাদটী সম্পূর্ণ সত্য। রোগী ও দুঃখিগণ রোগাদির আক্রমণ সময়ে কিছু কষ্ট পাইলেও যে সময়ে তাহাদের স্বাস্থ্যপর্য্যায় উপস্থিত হয়, তখন তাহারা বড় সুখ ভোগ করে। সুস্থ ও সুখী ব্যক্তি কোন কালেই সেরূপ সুখের অধিকারী হয় না। এই প্রকারে দেখা যায় যে, আপতিত দুঃখে কেহই ম্রিয়মাণ হয়েন না ও প্রাপ্ত সুখে কেহই নাচিয়া বেড়ান না। অভ্যাস দ্বারা সকল প্রকার দুঃখ ও সকল প্রকার সুখই লঘু হইয়া যায়। সেই জন্য কেহই জন্ম হইতে প্রাপ্ত অবস্থায় দুঃখ বা সুখ বোধ করেন না।

আজন্মদরিদ্রগণ যেরূপ গৃহে বাস করেন, যেরূপ পরিচ্ছদ পরিধান করেন, যেরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করেন, যেরূপে রৌদ্রবাতাদিতে ভ্রমণ করেন ও যেরূপ কঠিন পরিশ্রম করেন, ধনীদিগের গৃহপরিচ্ছদাদির সহিত তুলনা করিলে তৎসমস্ত অত্যন্ত কষ্টদায়ক বলিয়া বোধ হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক সে সকলে দরিদ্রের কিছুমাত্র কষ্ট হয় না। দরিদ্র যদি ধনীদিগের অবস্থার সহিত নিজের অবস্থার তুলনা না করিতেন, তাহা হইলে তিনি ক্ষণমাত্রও আপন দুরবস্থা জন্য দুঃখিত হইতেন না। পরের অবস্থার সহিত তুলনা করিয়াই তিনি দুঃখ বোধ করেন, নচেৎ যখন তিনি অনন্যমনে কার্য্য করেন তখন তাঁহার কিছু-মাত্র দুঃখ বোধ হয় না। ঐরূপ আজন্মধনীরা দরিদ্রের অবস্থার সহিত আপনার অবস্থার তুলনা করিয়াই গর্বিত হয়েন। যখন সেরূপ তুলনা না করেন তখন বাস্তবিক তিনি আপনাকে দরিদ্র অপেক্ষা কোন অংশেই অধিক সুখী বোধ করেন না। তাঁহার সুরম্য হর্ম্ম্য, দুগ্ধফেননিভশয্যা, সর্ব্বালঙ্কারভূষিতা বনিতা কিছুই দরিদ্রের কুটীরাদি অপেক্ষা কিঞ্চিন্মাত্রও অধিক সুখপ্রদ নয়। কেন না তিনি পলান্ন খাইয়া যেরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, দরিদ্র শাকমাত্র সহ আশু ধান্যের চাউলের অন্ন ভোজন করিয়া সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করেন, শূকর বিষ্ঠা ভোজন করিয়াও সেইরূপ তৃপ্তিলাভ করে। বাস্তবিক বৈষয়িক দুঃখ দুঃখই নহে, বৈষয়িক সুখ সুখই নহে। অধিক কি যে মৃত্যুভয়ে জীবগণ নিয়ত শশব্যস্ত, যাহার নাম স্মরণেই সকলে একান্ত ত্রস্ত সেই সর্ব্বলোক-ভয়াবহ মৃত্যুও বাস্তবিক ক্লেশকর নহে। যাঁহারা মনে করেন মৃত্যুর তুল্য

ভয়ানক যন্ত্রণা আর নাই তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। কেন না জন্মলাভ সময়ে যখন কেহ সুখবোধ করে না, তখন মৃত্যুমুখে পতিত হইবার সময়ে দুঃখ বোধ করিবে কেন? যাঁহারা ধর্ম্মপরায়ণ বৃদ্ধ বৃদ্ধাদিগকে সজ্ঞানে মরিতে দেখিয়াছেন, তাঁহাদিগকে এ বিষয় অধিক বুঝাইতে হইবে না। ধর্ম্মপরায়ণ প্রাচীনগণ যেরূপ প্রসন্নচিত্তে সময়োপযোগী আয়োজন করিয়া মৃত্যুপথে অগ্রসর হয়েন, তাহা দেখিলে কে না চমৎকৃত হয়? যদি বাস্তবিক মৃত্যু তাদৃশ যন্ত্রণাদায়ক হইত, তাহা হইলে কি তাঁহারা সহাস্যমুখে আপন মৃত্যুর সুব্যবস্থা করিতে পারিতেন? কখনই না। বাস্তবিক জন্মমৃত্যু লাভ-লোকসানের ব্যাপার নয়। মৃত্যু না থাকিলে জন্ম থাকিতে পারে না, আবার জন্ম না থাকিলে বাল্য, যৌবন প্রভৃতি বিবিধ অবস্থা—পিতা, মাতা, পুত্র, কন্যা, সহোদর প্রভৃতি সম্বন্ধ—শ্রদ্ধা, ভক্তি, ভয় প্রভৃতি মনোবৃত্তি, কিছুই থাকে না, চিরকাল অর্থাৎ অনাদি অনন্ত কাল জীবগণকে একই ভাবে থাকিতে হয়, সুতরাং কিছুমাত্র সুখের আশা থাকে না। তাই আমাদের সুখবিধান ও সৃষ্টি ক্রিয়া সার্থক করিবার জন্যই জন্ম মৃত্যুর ব্যবস্থা হইয়াছে। বাস্তবিক কেহ জন্মে না ও কেহ মরে না। বাল্য যৌবনাদি যেমন আমাদের অবস্থা ভেদ, জন্ম মৃত্যুও সেইরূপ অবস্থা ভেদমাত্র। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—

> দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
> তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥
> বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
> তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥
>
> শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা।

যখন আমরা দুদিন একভাবে থাকিলে অসহ্য কষ্ট অনুভব করি, যখন আমরা ৪।৫ ঘণ্টা মাত্র আমোদ করিয়াই ক্লান্ত হইয়া পড়ি, তখন চিরকাল একরূপ অবস্থায় থাকিতে হইলে যে আমাদিগকে অসহনীয় যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইত তাহাতে আর কথা কি? এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায়, দুঃখ ও বৈষম্য জীবের কল্যাণকর ভিন্ন অকল্যাণকর নহে। অতএব দুঃখের সৃষ্টিকর্ত্তা ও বৈষম্যবিধায়ক বলিয়া ঈশ্বরের ঈশ্বরত্ব অপ্রতিপাদিত হয় না। প্রত্যুত ইহা দ্বারাই তাঁহার অপরিমেয় কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়।

নাস্তিক হয় ত বলিবেন, পরমেশ্বর কেন সুখকে দুঃখ মিশ্রিত করিলেন? তিনি যখন সর্ব্বশক্তিমান, তখন ত তিনি খাঁটি সুখের সৃষ্টি করিতে পারিতেন। আমাদের বোধ হয় নাস্তিকগণের এরূপ তর্ক উত্থাপন করিবার অধিকারই নাই। কেন না ইহ সংসারে সর্ব্বলোকগত নিত্য বৈষয়িক সুখ যে হইতে পারে অর্থাৎ এককালীন দুঃখসংস্রবশূন্য বৈষয়িক সুখ যে হইতে পারে একথা বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুমোদিত নহে। যাহা জ্ঞানের বিষয় নহে, বিজ্ঞানের বিষয় নহে, নাস্তিকগণের তদ্বিষয়ক আলোচনা করিবার কিছুমাত্র অধিকার নাই। কেননা তাঁহারা বিজ্ঞানেরই দোহাই দিয়া আস্তিকগণকে আক্রমণ করিয়া থাকেন। একমাত্র বিজ্ঞান শাস্ত্রই তাঁহাদিগের সকল জ্ঞানের আশ্রয়। যাহা বৈজ্ঞানিক প্রমাণে সিদ্ধ নয় তাহা সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে তাঁহারা এককালে অসম্মত। যদি বলা যায়, পরমাণুর আকর্ষণ শক্তি আছে কেন? তাপ উষ্ণস্পর্শ ও বিস্তারক কেন? চিনি মিষ্ট কেন? ও তিন্তিড়ি অম্ল কেন? নাস্তিক কি তাহার উত্তর দিতে পারেন? যদি না দিতে পারেন, তবে 'সুখ দুঃখ পরস্পর মিশ্রিত কেন' এ প্রশ্ন কোন্ যুক্তিবলে জিজ্ঞাসা করেন? দেখিয়া শুনিয়াই মানবের জ্ঞান। যাহা আছে, তাহাই আমাদের জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিষয়। যাহা নাই, তাহা থাকিলে ভাল হইত, কিংবা তাহা নাই কেন ও তাহা হইল না কেন? এরূপ প্রশ্ন বালকের মুখেই শোভা পায়। শিশু মাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, ভাত খাইতেছ কেন? মাতা উত্তর করিল, ক্ষুধা হইয়াছে। বালক বলিল, ক্ষুধা হইল কেন? মাতা বলিলেন অনেকক্ষণ খাই নাই। শিশু আবার জিজ্ঞাসা করিল অনেকক্ষণ খাও নাই কেন? শিশু এইরূপ ক্রমাগত প্রশ্ন করিতে থাকে? বৈজ্ঞানিকও কি সেইরূপ প্রশ্ন করিবেন? চুনে হলুদে মিশিয়া লাল হয় কেন? এ প্রশ্নের উত্তরে, উহাদের পরস্পরের সহিত পরস্পরের রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে, ইহাই বৈজ্ঞানিক উত্তর। কিন্তু যদি জিজ্ঞাসা করা যায় কেন উহাদের রাসায়নিক সম্বন্ধ আছে, জলের সহিত চুনের ঐরূপ সম্বন্ধ নাই কেন, তাহার উত্তর যেমন বৈজ্ঞানিক দিতে অসমর্থ, সেইরূপ কি জন্য দুঃখ না থাকিলে সুখ হয় না এ উত্তরও বৈজ্ঞানিক দিতে অসমর্থ। আকর্ষণ শক্তি কি নিয়মে কার্য্য করে, তাপ কি নিয়মে পদার্থের বিস্তৃতি বৃদ্ধি করে, তাড়িত কত দ্রুতবেগে গমন করিতে

পারে, সুখ দুঃখের কিরূপ মিশ্রণ মানবের কল্যাণকর হয় ইত্যাদি বিষয়ই বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধিকারভুক্ত। কেন এরূপ হইল, ওরূপ হইল না কেন, এ জাতীয় বিচার বিজ্ঞানের অধিকার ভুক্ত নয়, ও সকল শিশুর অধিকারভুক্ত। যদি নাস্তিক সেই শিশুদলে যোগ দেন, তাহা হইলে তাঁহার আস্তিকগণকে বিদ্রূপ করার কিছুমাত্র অধিকার নাই। যাহারা ঘেটু মাকালকেই পরমেশ্বর বলে, তাহাদিগকে বিদ্রূপ করিবারও অধিকার তাঁহাদের নাই; তাঁহারা কেবল শিশুর ন্যায় প্রশ্নই করিতে পারেন, কোন বিষয় যুক্তিহীন বা অমঙ্গলকর এরূপ বলিবার অধিকার তাঁহাদের নাই। অতএব যদি যুক্তি মানিতে হয় তবে দুঃখ সংস্রব শূন্য সুখ যে হইতে পারে না এ সিদ্ধান্তের প্রতি সন্দেহ জন্মিতে পারে না।

নাস্তিক বলিতেছেন নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিশ্বকার্য্য চলিতেছে, ঈশ্বরের তদন্যথা করিবার সামর্থ্য নাই, সুতরাং তাঁহার উপাসনায় কোন ফল নাই। কিন্তু বাস্তবিক একথা নিতান্ত ভ্রান্তিসঙ্কুল। কেন না স্পষ্টই দেখিতে পাওয়া যাইতেছে, একইভাবে বিশ্বকার্য্য চলিতেছে না। চিরকালই শীতের পর গ্রীষ্ম ও গ্রীষ্মের পর বর্ষা হইয়া থাকে বটে, কিন্তু সকল বৎসর সমান গ্রীষ্ম, সমান শীত ও সমান বর্ষা হয় না। প্রতি বৎসরই পৃথিবী শস্য প্রসব করে বটে, কিন্তু কোন বৎসর একান্ত অজন্মা হইয়া দুর্ভিক্ষে মানবকুলের ধ্বংশ সাধন করে ও কোন বৎসর অপর্য্যাপ্ত শস্য জন্মে। যদি নির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিশ্ব-কার্য্য চলিত, তাহা হইলে কখনই এরূপ ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ফল উৎপন্ন হইত না। তাহা হইলে প্রতি বৎসরই চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ নক্ষত্রাদি যেরূপ নির্দ্দিষ্ট সময়ে উদিত ও অস্তমিত হইয়া থাকে, সমস্ত ব্যাপারই ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সংসাধিত হইত। তাহা হইলে মানব জ্যোতিঃশাস্ত্রের ন্যায় অন্য সকল বিষয়েরই ভবিষ্যৎ ফলজ্ঞাপক শাস্ত্র প্রণয়ন করিতে পারিত। কিন্তু কোন্ বিষয় নির্দ্দিষ্ট নিয়মে সাধিত হইয়া থাকে? কোন বৎসর অতি বৃষ্টি ও কোন বৎসর অনাবৃষ্টি হইতেছে। কখন শীতকালে প্রচুর বারি বর্ষণ হইতেছে, কখন বর্ষাকালেও বৃষ্টিপাত হয় না। এই দেখিতেছি নির্ম্মল আকাশে দিবাকর তীক্ষ্ণ কর প্রদান করিতেছে, পর ক্ষণেই আকাশ নিবিড় মেঘে আচ্ছন্ন হইল, মুষল ধারে বৃষ্টি হইতে লাগিল, প্রবল বাত্যায় গৃহ ও অট্টালিকা ভগ্ন হইল, করকাঘাতে

শরীর বিদীর্ণ হইল, সৌদামিনীর ঘন বিকাশে নয়ন বাঁধিয়া গেল, শীতে শরীর থর থর কম্পিত হইতে লাগিল। এই দেখিতেছি জীবগণ সুখে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছে, কিন্তু দেখিতে দেখিতে ভূকম্প উপস্থিত হইল, ভূগর্ভ বিদীর্ণ হইল, প্রবলবেগে অত্যুষ্ণ বাষ্প ও ধাতুনিস্রব উৎক্ষিপ্ত হইয়া চতুর্দ্দিক আচ্ছন্ন করিল, সমগ্র মানবমণ্ডলী সর্ব্ব প্রকার প্রাণী ও সর্ব্ববিধ উদ্ভিদ অকালে কালকবলে কবলিত হইল। এই দেখিতেছি কৃষকগণ দিবা রাত্রি পরিশ্রম করিয়া যে শস্য রোপণ করিয়াছিল, তৎ সমস্ত ফলভরে অবনত হইয়া মাঠের অতুল শোভা সম্পাদন করিয়াছে, প্রচুর শস্য প্রাপ্ত হইবে এই আনন্দে কৃষকগণ আনন্দগীত গাইতেছে, কিন্তু হঠাৎ নদী উৎক্ষিপ্ত হইল, অনতিবিলম্বেই দেশ প্লাবিত হইল। সমস্ত শস্য, সমুদায় বাসগৃহ সকলই ডুবিয়া গেল, গো-বৎস প্রভৃতি কোথায় ভাসিয়া চলিল, স্ত্রী পুত্র রক্ষা করা ভার হইল, থাকিবার স্থান নাই, পরিধেয় বসন নাই, ক্ষুধা শান্তি করিবার কিছুই নাই, নিতান্ত দুরবস্থায় পতিত হইয়া মানবগণ হাহারবে ক্রন্দন করিতে লাগিল। এই দেখিতেছি নরনারীগণ প্রফুল্ল চিত্তে আমোদ প্রমোদ করিতেছে, হঠাৎ দেশে মহামারী প্রবেশ করিল, প্রতি ঘরে হাহাকার পড়িয়া গেল, স্ত্রী পুত্র ভাই ভগিনী প্রতিবেশী সকলেই পীড়িত, কে কাহাকে দেখে, জল বিন্দু দিবার লোক নাই, মৃত দেহ স্থানান্তরিত করে এমন লোক নাই, দেশ মহা শ্মশানে পরিণত হইয়া গেল। এ সকল কি নির্দ্দিষ্ট নিয়মের ফল? যদি চিরনির্দ্দিষ্ট নিয়মে বিশ্ব-কার্য্য পরিচালিত হইত তাহা হইলে কি এ সকলের পূর্ব্বলক্ষণও পরিজ্ঞাত হইতে পারা যাইত না? না তাহা হইলে নির্দ্দিষ্ট কাল ভিন্ন কোন সময়েই কোন ব্যাপার সংঘটিত হইতে পারিত? কখনই নহে। মানবের অনু-ষ্ঠিত একবিধ কার্য্যেরও একবিধ ফল ফলিতে দেখা যায় না। রাম ও হরি একই স্থানে শয়ন করিয়া আছে, সর্প রামকে দংশন করিল, হরিকে দংশন করিল না। দুইজন একই স্থানে বসিয়া আছে, বজ্রাঘাতে একজনের প্রাণ নাশ হইল; দুইজনে নদীর একই স্থানে স্নান করিতেছে, এক জনকে কুম্ভীরে লইয়া গেল। দুই জনে এক স্থানে একইরূপ ব্যবসা করিতেছে, একজন অতুল ধনশালী হইল, অন্যের মূলধন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া গেল। দুই জন একই শিক্ষকের নিকট একই প্রকারে বিদ্যা শিক্ষা

করিতেছে, একজন জগন্মান্য পণ্ডিত হইলেন, অন্যে মূর্খ ও নিতান্ত কদাচারপরায়ণ হইল। জগতে নিত্য এইরূপ লক্ষ লক্ষ বিসংবাদী ঘটনা পরিদৃষ্ট হইতেছে, তথাপি বলিব বিশ্বকার্য্য একই নিয়মে চলিতেছে? কোন অকাট্য যুক্তিবলে সপ্রমাণ হইতে পারে যে বিশ্ব-কার্য্য একই নিয়মে পরিচালিত হইতেছে? কি যুক্তি, কি প্রত্যক্ষ, কিছুই উহার পোষক নহে। প্রত্যুত যোগশাস্ত্র, প্রেততত্ত্ব, ভক্তিশাস্ত্র উহার পদে পদে বিপরীত সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। যোগী ও ঈশ্বরভক্তগণ যে সকল অনৈসর্গিক অত্যাশ্চর্য্য কার্য্য সমাধান করেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কত যোগী অনাহারে নির্বাতে পৃথিবী গহ্বরে বাস করিয়াও বহুশতবৎসর জীবিত থাকেন এবং অগ্নিপ্রবেশ ও বিষভক্ষণাদিতেও ভক্ত প্রহ্লাদের প্রাণনাশ হয় নাই। আধুনিক প্রেতপরায়ণ দিগকেও অনেক অনৈসর্গিক কার্য্য করিতে দেখা যায়। প্রত্যক্ষমূলক নয় বলিয়া যাঁহারা ঐ সকল বিশ্বাস করিতে আপত্তি করেন তাঁহাদিগকে হোমিওপ্যাথিক ও এলোপ্যাথিক চিকিৎসাপ্রকরণের বিষয় আলোচনা করিতে বলি। এলোপ্যাথিক ডাক্তারগণ বমি করাইবার জন্য চিরকাল ইপিকাক ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন ও তাহাতে সকলেরই বমি হইয়া আসিতেছে, কিন্তু এক্ষণে হোমিওপ্যাথিক ডাক্তারগণ বমি নিবারণ করিবার জন্য সেই ইপিকাক সেবন করাইতেছেন। বমিকারক ইপিকাক দ্বারা সকল প্রকার বিবমিষাই নিবারিত হইতেছে। ঔষধ অল্প মাত্রায় ফলপ্রদ না হইলে, এলোপ্যাথগণ তাহা অধিক মাত্রায় সেবন করাইয়া রোগ আরাম করিয়া থাকেন কিন্তু হোমিওপ্যাথগণ অধিক ঔষধে যে রোগ সারিল না দেখিলেন, সে রোগ অল্প মাত্রা ঔষধ সেবন করাইয়া আরাম করিতেছেন—তৃতীয় ডাইলিউসন ঔষধে যে রোগ না যায় তাহা ত্রিংশৎ ডাইলিউসনে আরাম হয়। যখন এলোপ্যাথিক ও হোমিওপ্যাথিক উভয় প্রকার চিকিৎসারই উপকার-কারিতা নিয়ত প্রত্যক্ষ হইতেছে, তখন উহাদের কাহারই প্রদর্শিত নিয়মকে অস্বাভাবিক বলিতে পারি না। যদি একটীকে অস্বাভাবিক বলিতে চাও, তবে অন্যের প্রকৃতিবিরুদ্ধ আচরণে ফল লাভ হয় কেন? দেখা যাইতেছে কত কত লোক চিকিৎসিত হইয়া আরোগ্য লাভ ও কুপথ্য ভোজন করিয়া প্রাণত্যাগ করিতেছেন। আবার ইহাও দেখা যাইতেছে যে, কত লোক চিকিৎসিত হইয়া প্রাণ হারাইতেছেন

ও কুপথ্য ভোজন করিয়া আরোগ্য লাভ করিতেছেন। অতএব আমরা চিকিৎসার উপকারিতা স্বীকার করিব? না কুপথ্য সেবনের উপকারিতা স্বীকার করিব? যদি ইহার একটী নির্দ্দিষ্ট নিয়ম হয়, তবে তাহার বিপরীত কার্য্য সুফল প্রসূ হয় কেন? অতএব স্পষ্ট বুঝিতে পারা যাইতেছে, যে বিশ্ব-নিয়ম নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন নহে। সুতরাং ভ্রান্ত আনুমানিক যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া ঈশ্বরের উপাসনার আবশ্যকতা নাই বলা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। প্রত্যুত আমরা ঈশ্বরের উপাসনার উপকারিতা পদে পদে দেখিতে পাইতেছি।

ঈশ্বরারাধনায় যে আনন্দ লাভ হয় তাহা অতুলনীয়। কোন বৈষয়িক সুখে মানবের এত আনন্দ হয় না। যখন আমরা প্রাণ ভরিয়া সেই পরম-পিতাকে আহ্বান করি, তখন আমাদের হৃদয় পুলকে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন আর আমাদের কোন প্রকার দুঃখই থাকে না। যখন আমরা নিদারুণ রোগ যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া পড়ি, যখন নিরাশায় এককালে দিশা-হারা হই, তখন সেই পরাৎপরের নাম কি আমাদের হৃদয়ে শান্তি ঢালিয়া দেয় না? যে নিদারুণ মৃত্যু সময়ে আমাদিগকে এই সাধের সংসার ত্যাগ করিয়া যাইতে হয়, যখন স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি প্রিয় পরিবার বর্গ, কত কষ্টে উপা-র্জ্জিত সাধের অট্টালিকা, উদ্যান ও নানাবিধ মনোহর গৃহসামগ্রী এবং হৃদয় মোহিনী আশা সমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে, এই দুঃখে হৃদয় একান্ত জর্জ্জরিত, তখন সেই জগদীশ্বরের ভক্তিপূর্ণ নামই আমাদের একমাত্র শান্তিপ্রদ। পাঠক! একবার বাল্যকালের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, যখন অবিশ্বাস তোমার হৃদয়কে নীরস মরু তুল্য করে নাই, সেই বাল্য বা যৌবন কালের কথা স্মরণ করিয়া দেখ, পূজার সময় আরতি হইতেছে, ঢাক ঢোল ও শঙ্খ বাদ্য অতিক্রম করিয়া মা মা ধ্বনি গগনভেদ করিয়া উঠিতেছে, সে সময়ে তোমার মনে কি অতুলনীয় আনন্দ অনুভব হইত। সমগ্র পৃথিবীর অধীশ্বর হইলে কি সেরূপ অতুলনীয় আনন্দ প্রাপ্ত হওয়া যায়? ঐ দেখ ভক্ত বৈষ্ণবগণ কেবল "গৌর নিতাই" এই মাত্র শব্দ করিতে করিতে দুই বাহু তুলিয়া কিরূপ নৃত্য করিতেছে। ঐ নৃত্যের সঙ্গে যে তাহার হৃদয় মহানন্দে নাচিতেছে তাহা কি বুঝিতে পারিতেছ না? যদি ঈশ্বরের উপাসনা কিছুই নহে, তবে এ আনন্দ কোথা হইতে আইসে? ঐ অতুলনীয় আনন্দ অকারণ-

সম্ভূত, এ কথা কি বৈজ্ঞানিক যুক্তির অনুমোদিত? কত লোক ঈশ্বর-প্রেমে মগ্ন হইয়া সংসারের যাবতীয় বৈষয়িক সুখ ও সর্ব্বপ্রকার মায়া পরিত্যাগ করিয়া পরাৎপর পরমেশ্বরে অনুরক্ত হইতেছে। যদি ঈশ্বরোপাসনা কাল্পনিক, তবে উপাসকগণের ইন্দ্রিয় ও রিপুগণের প্রবল আকর্ষণ কিরূপে নিবারিত হয়? অকার্য্য হইতে কখনও কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। যখন ঈশ্বরোপাসনার এই সকল প্রত্যক্ষ ফল পরিদৃষ্ট হইতেছে, অর্থাৎ যখন দেখা যাইতেছে ঈশ্বরপ্রেম সকল প্রকার বৈষয়িক সুখাসক্তি বিদূরিত করিতেছে, ও ভক্ত হৃদয়ে অতুল নির্ম্মল আনন্দ দান করিতেছে তখন ঈশ্বরোপাসনা কখনই অবাস্তব বিষয় নহে। প্রত্যুত উহার শক্তি অতিশয় বলবতী। উহার বলবতী শক্তি প্রভাবে অতি দুর্দ্দান্ত রিপুও শাসিত হয়। আর এক কথা এই যে ঈশ্বর যদি উপাস্য না হয়েন, তবে ভক্তি ও প্রেম আমাদের হৃদয়ে বর্ত্তমান কেন? ক্ষুধা দেখিয়া যেমন খাদ্য দ্রব্যের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয়, ভক্তিপ্রেম দেখিয়া সেইরূপ ঈশ্বরোপাসনার প্রয়োজনীয়তা সপ্রমাণ হয়। অতএব ঈশ্বরের উপাসনা করা যে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। যদি স্বীকার করা যায়, বিশ্ব-কার্য্য নির্দ্দিষ্ট একই নিয়মে চলিতেছে, তদন্যথা করিবার শক্তি ঈশ্বরের নাই, তাহা হইলেও এই অতুল আনন্দ লাভ করিবার জন্য ঈশ্বর আমাদের উপাস্য। অর্থাৎ তদীয় উপাসনায় বৈষয়িক ফল লাভ না হইলেও অপার নির্ম্মল আনন্দ লাভ করিবার জন্য এবং বিষয়ের জটিলতা ও দুর্দ্দান্ত রিপুগণের পরস্পর বিসম্বাদী প্রবল আকর্ষণজনিত দুঃখ নিবৃত্তি করিবার জন্য তিনি আমাদের উপাস্য—ভক্তি ও প্রেম বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিবার জন্য তিনি আমাদের উপাস্য।

এই প্রকারে আলোচনা করিলে নাস্তিকগণের সকল আপত্তিই খণ্ডিত হইয়া যায়। যত বৈজ্ঞানিক আলোচনা হইবে, ততই ঈশ্বরের সত্তা সপ্রমাণ হইবে। পরমেশ্বর বিশ্ব দ্বারাই প্রকাশিত হয়েন। মনু বলিতেছেন—

—স্বয়ম্ভুর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥
যোঽসাবতীন্দ্রিয়গ্রাহ্যঃ সূক্ষ্মোঽব্যক্তঃ সনাতনঃ।
সর্ব্বভূতময়োঽচিন্ত্যঃ সএব স্বয়মুদ্বভৌ॥

ইহার তাৎপর্য্য এই যে, ঈশ্বরকে জানিবার আমাদের কিছুমাত্র শক্তি নাই। কেন না তিনি অতীন্দ্রিয় ও একান্ত ও সূক্ষ্ম; কেবল বিশ্ব দ্বারাই তিনি আমাদের নিকট প্রকাশিত হয়েন। অতএব আমরা যত বিশ্ব বিষয়ে জ্ঞান লাভ করিব, ততই তাঁহার মহিমা অবগত হইতে পারিব। বিজ্ঞানশাস্ত্রের অনুশীলনই ঈশ্বরের সত্তা ও মহিমা অবগত হইবার একমাত্র উপায়। অতএব যাঁহারা বলেন ঈশ্বর বিজ্ঞানের বিষয় নহেন, তাঁহারা নিতান্ত ভ্রান্ত। বরং একথা বলা যাইতে পারে যে, বিজ্ঞান দ্বারা আমাদের সত্তা অপ্রমাণ হয়, তথাপি বিজ্ঞান ঈশ্বরের পরিচয় প্রদান করিতে পারে না একথা কিছুতেই বলা যায় না।

এইস্থলে একটী কথা বলা আবশ্যক; অর্থাৎ কেহ যেন বুঝেন না যে কেবল প্রত্যক্ষমূলক পাশ্চাত্য পদার্থ বিজ্ঞানই আমাদের আলোচ্য বিজ্ঞানপদবাচ্য। যদ্দ্বারা তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় অর্থাৎ যদ্দ্বারা যাহা যাহা তাহাকে তাহা বলিয়া জানা যায়, তাহাই প্রকৃত বিজ্ঞানপদবাচ্য। সুতরাং আপ্তবাক্যও বিজ্ঞানের অন্তর্গত। এ সকল বিষয় আমরা পূর্ব্বে বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা যাহাকে বিজ্ঞান বলেন তাহা পূর্ণবিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞানের সামান্য অংশ মাত্র। দর্শন শাস্ত্র, পদার্থবিদ্যা, আপ্তবাক্য সমস্তই বিজ্ঞানের অন্তর্গত। কেবল পদার্থ বিজ্ঞানে জ্ঞান লাভ করিলে সকল বিষয়ে জ্ঞান জন্মে না। সকল জ্ঞাতব্য মাত্রে জ্ঞানলাভ করিলেও আমাদের কার্য্যসিদ্ধি হয় না। জ্ঞানলাভের সঙ্গে সঙ্গে সাধনার প্রয়োজন। তত্ত্বজ্ঞান ও সাধনশক্তি লাভের উপায় বিদিত হইলে তবে সিদ্ধিলাভ করিবার চেষ্টা করিতে পারা যায় এবং তাহা হইলেই আমরা আত্মসাক্ষাৎকার লাভ করিয়া ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভের যত্ন করিতে পারি। সুতরাং অনুশীলন তত্ত্বও বিজ্ঞান শাস্ত্রের অন্তর্গত।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্ম।

ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনা করিয়া যখন স্পষ্টই বুঝা গেল যে আমরা কিছুই নহি, তখন আমাদের নিজের কোন আকাঙ্ক্ষা বা নিজের কিছু প্রয়োজন থাকিতে পারে না; অর্থাৎ এ জগতে যাহা যাহা আছে তাহার কিছুই যখন স্বশক্তিজাত নহে, সমস্তই ঈশ্বরের সৃষ্ট, তখন কোন জীবেরই নিজের কোন কার্য্য, নিজের কোন প্রার্থনীয় বা নিজের কোন ভোগ্য নাই। ঈশ্বর যাহাকে যাহা করিতে দিয়াছেন, তাহাই তাহার কার্য্য, যাহাকে যাহা পাইতে দিয়াছেন তাহাই তাহার প্রার্থনীয়, যাহাকে যাহা ভোগ করিতে দিয়াছেন তাহাই তাহার ভোগ্য। সুতরাং যে কোন উপায়ে আমরা আপন আপন রুচি অনুসারে সুখ ভোগ করিতে পারি না—সুখভোগই আমাদের কার্য্যের একমাত্র লক্ষ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ যখন ঈশ্বরই সমস্ত সুখ দুঃখের বিধাতা ও ঈশ্বরই আমাদের সৃষ্টিকর্ত্তা তখন সুখভোগ মাত্রই আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। কেন না ঈশ্বর যে আমাদিগকে সুখী করিবার জন্যই আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ আমাদের যখন অস্তিত্বমাত্র ছিল না, তখন কি সুখ কি দুঃখ কিছুই আমাদের প্রার্থনীয় থাকিতে পারে না, অর্থাৎ যখন আমরাই ছিলাম না, তখন আমাদের কোন প্রকার প্রয়োজন থাকা সম্ভব নয়। তবে আমাদের সুখের জন্য তিনি আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, এ কথার অর্থ কি? যদি আমরা বর্ত্তমান থাকিয়া দুঃখভারে একান্ত পীড়িত থাকিতাম, তাহা হইলে বলা যাইতে পারিত যে, ঈশ্বর আমাদের দুঃখ নিবারণ ও সুখ বিধান করিবার জন্য নানাবিধ সুখকর পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন। কিন্তু যখন তাহা নয়, যখন আমরাই তাঁহার সৃষ্ট, তখন আমাদের সুখের উদ্দেশে আমাদের সৃষ্টি এ কথা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। তুমি ঐ যে পুতুলটী গড়িয়াছ উহা কি ঐ পুতুলের সুখের জন্য না

তোমার সুখের জন্য? ঐ পুতুল গড়া যদি পুতুলের উপকারের জন্য বলিতে পারা যায় তাহা হইলেও জগতের উপকারের জন্য জগতের সৃষ্টি—মানবের উপকারের জন্য মানবের সৃষ্টি একথা বলিতে পারা যায় না। কেন না পুতুলের উপকরণাদি ছিল, তুমি ঐ উপকরণ গুলি ভিন্ন রূপে বিন্যস্ত করিয়াছ মাত্র, এ জগতের উপকরণও ছিল না, সকলই ঈশ্বরের কৃত। যদি বল বিশ্বের উপকরণ ছিল বা বিশ্ব নিত্য, তাহা হইলেও বলিতে হইবে, চিরকালই ঐ উপকরণ এক ভাবে আছে অর্থাৎ তদুৎপন্ন পদার্থ ও জীবকুলও চিরকাল বর্ত্তমান আছে। কিন্তু যাহা চিরকাল আছে ও চিরকাল থাকিবে তাহার জন্ম মৃত্যু, সুখ দুঃখ, অবনতি উন্নতি কিছুই থাকিতে পারে না, সুতরাং তাহার কোন উদ্দেশ্যও থাকিতে পারে না। যে কার্য্য নূতন সংঘটিত হয় তাহারই কোন উদ্দেশ্য আছে বুঝিতে হয়; যাহা চিরকাল আছে তাহার উৎপত্তিও নাই সুতরাং তদুৎপত্তির উদ্দেশ্যও নাই। অতএব যে রূপেই বিচার করা যাউক, সুখ সমগ্র বিশ্বের বা আমাদের উদ্দেশ্য হইতে পারে না। অর্থাৎ যদি বল জগৎ বা ইহার উপকরণ কিছুই ছিল না, ঈশ্বরের ইচ্ছাতেই সমস্ত সৃষ্টি হইয়াছে, তাহা হইলে জগতের সুখ উদ্দেশে জগৎ সৃষ্ট হওয়া সম্ভব নহে, আর যদি বল এই জগৎ চিরকালই আছে ইহার সৃষ্টিও নাই বিনাশও নাই, তাহা হইলে ইহার আরম্ভ না থাকায় ইহার মূলে কোনও উদ্দেশ্য থাকা সম্ভব নহে। অতএব সুখলাভ আমাদের উদ্দেশ্য এ কথা নিতান্ত যুক্তিবিরুদ্ধ। কেবল অনুমানমূলক যুক্তির বিরুদ্ধ নহে, প্রত্যক্ষ প্রমাণেরও বিরুদ্ধ। কেন না যদি সৃষ্ট পদার্থের সুখ বিধানই সৃষ্টির মুখ্য উদ্দেশ্য হয় তবে কেবল মানবের সুখ উদ্দেশ্য হইতে পারে না; তাহা হইলে সমগ্র মানবমণ্ডলীর, সমস্ত জীবকুলের, জড়াজড় সমস্ত পদার্থেরই সুখ বিধান সৃষ্টি ক্রিয়ার উদ্দেশ্য বলিতে হইবে! কিন্তু কৈ, কে নিয়ত সুখভোগ করিতেছে?

ঐ যে বুদ্বুদ্ জল হইতে উঠিয়া জলে মিলাইয়া গেল উহার কি সুখ সাধন হইল? ঐ যে গোলাপ, বেল, মল্লিকা, মালতী প্রভৃতি পুষ্পগণ প্রস্ফুটিত হইয়া নয়নরঞ্জন শোভা ও মনোহর গন্ধ বিস্তার দ্বারা সকলের মনঃ প্রাণ হরণ করিল ও রজনী মাত্র অবস্থান করিয়া শুষ্কদেহ হইয়া মরিয়া গেল, উহার কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে ধান্য, মুদ্গ, গোধুম প্রভৃতি নয়ন ও

হৃদয়ানন্দ দায়িনী শস্যাবলী মাঠের অপূর্ব্ব শোভা বিস্তার ও প্রচুর পরিমিত শস্য দান দ্বারা বহুতর জীবের খাদ্য সংস্থাপন করিয়া মাসত্রয় পরেই গতাশু হইল, উহার কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে সুদর্শন প্রজাপতি প্রভৃতি পতঙ্গ সকল আকাশ মার্গে উড্ডীন হইয়া মানবের মনোহরণ ও উর্ণাসূত্র প্রস্তুত করিবার উপায় করিয়া দিয়া কিছু দিন পরেই জীবলীলা সম্বরণ করিল, উহাদের কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে সুশোভন অশ্ব ও নিরীহ গোজাতি হল শকট পরিচালন, পৃষ্ঠে ও স্কন্ধে শকটাদি বহন ও দ্বিতীয় জীবন স্বরূপ দুগ্ধ প্রদান করিয়া মানবের প্রভূত হিত সাধন করিল, তাহাতে উহার কি সুখ সাধিত হইল? ঐ যে ছাগ মেষ প্রভৃতি নিরীহ জীবকুল আপনার মাংস দ্বারা হিংস্র প্রাণিগণের ও মানবের সুখ সাধন করিয়া অকালে জীবন ত্যাগ করিল, তাহাতে উহাদের কি সুখ সাধিত হইল? ঈশ্বর কি জন্য এ সকলের সৃষ্টি করিয়াছেন? স্ব স্ব সুখ সাধনই কি ইহাদের উদ্দেশ্য? তাহা যদি হয় তবে ইহাদের সুখ কোথায়? যদি বল ইহাদের সুখসাধন করা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়, মানবের সুখসাধনই তাঁহার সকল কার্য্যের মুল উদ্দেশ্য, তবে ইহাদের উৎপত্তি হইয়াছে কেন? কি জন্য বুদ্বুদের উৎপত্তি হইয়াছে, কি জন্য পুষ্প, শস্য, কীট, পতঙ্গ ও নিরীহ জীব সকলের সৃষ্টি হইয়াছে? যদি উহাদের আপন সুখ সাধন উদ্দেশ্য না হইল তবে উহাদের উদ্দেশ্য কি? যদি বল মানবের সুখসাধন জন্য উহাদের প্রয়োজন ও তজ্জন্য উহাদের সৃষ্টি, তবে মানব যে অন্যের সুখ সাধনের জন্য সৃষ্ট নয়—আপনার সুখের জন্যই সৃষ্ট তাহার প্রমাণ কি? কেবল মানবেরই সুখ যে মুখ্য উদ্দেশ্য তাহা তুমি কিসে বুঝিলে? হয় বল সকল পদার্থ আপন আপন সুখ সাধন জন্য সৃষ্ট, না হয় বল সমস্তেরই উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র। কতক পদার্থ পরের সুখ সাধন জন্য সৃষ্ট ও কতক পদার্থ আপন সুখের জন্য সৃষ্ট এ কথা বলিতে হইলে তাহার স্পষ্ট প্রমাণের আবশ্যক। কিন্তু কোন্ যুক্তি তোমার এ কথার পোষক? বহুতর দ্রব্য মানবের প্রয়োজনে লাগে দেখিয়া কি ভাবিয়াছি পরমেশ্বর ঐ সকল কেবল মানবের সুখের জন্যই সৃষ্টি করিয়াছেন? মানব শস্য ও মাংস ভোজন করে, পুষ্পের গন্ধ আঘ্রাণ করে, বস্ত্র পরিধান করে, গৃহ প্রস্তুত করে; এইরূপ ও অন্যান্য বহুতর কার্য্যে মানবের বহুতর ইতর প্রাণী, উদ্ভিদ্ ও জড় পদার্থের প্রয়োজন আছে দেখা

যায়, তাই ভাবিয়াই কি সমস্ত পদার্থ ও জীবগণ মানবের সুখের জন্যই সৃষ্ট হইয়াছে স্থির করিয়াছ? যদি এই যুক্তি অনুসরণীয় হয় অর্থাৎ যে দ্রব্য যাহার প্রয়োজনে লাগে সে দ্রব্য তাহারই জন্য সৃষ্ট হইয়াছে বলিতে হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে, উদ্ভিদ্ সকল গোমেষাদির জন্য সৃষ্ট; আলোক, তাপ, জল প্রভৃতি উদ্ভিদ্ সকলের জন্য সৃষ্ট এবং নিরীহ জীবগণ ও জীবশ্রেষ্ঠ মানব সিংহব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তুর ভক্ষণ জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। বাস্তবিক কি ব্যাঘ্রাদির আহারের জন্য মানবের সৃষ্টি হইয়াছে? অবশ্য কখনই না। সুতরাং এ যুক্তি নিতান্ত অসার। জিজ্ঞাসা করি মানবের সুখবিধানই যে, ঈশ্বরের মুখ্য উদ্দেশ্য এরূপ বিবেচনা করিবার তোমার অভিপ্রায় কি? মানব কি বাস্তবিক বড় সুখী? কৈ কোনও মানবকেই ত সুখী বলিয়া বোধ হয় না।

গর্ভবাসকাল ও শৈশবকালের কথা আমাদের কিছু স্মরণ নাই বটে, কিন্তু যে বয়সের কথা আমাদের স্মরণ আছে, সে সময় হইতে আমরা কবে সুখী হইয়াছি? রোগ, শোক, অবস্থাবিপর্য্যয় প্রভৃতি যে সকল দুঃখ মানবের স্বদোষে সমুৎপন্ন হয় বলিয়া কথিত হইয়া থাকে, সেগুলি ছাড়িয়া দিয়া কেবল মাত্র যে স্বাভাবিক দুঃখ গুলি মানব মাত্রকেই ভোগ করিতে হয়, তাহারই বিষয় ভাবিয়া দেখিলেই বুঝা যায়, মানব এক দিনও সুখী নহে। শৈশবকালে মানব একান্ত পরাধীন থাকে, তখন কোন ইচ্ছাই পূর্ণ হয় না, এমন কি শিশু মনের কোন ইচ্ছা প্রকাশই করিতে পারে না, নিয়ত পরের মুখাপেক্ষা করিয়া অশেষ দুঃখ ভোগ করে। পরে যৌবনকালে পরস্পর বিপরীতগুণসম্পন্ন ইন্দ্রিয় ও রিপু সকল প্রবল হইয়া নানাবিধ লোভনীয় কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া নানা বিষয়ে টানাটানি করিতে থাকে; একবার কাম, একবার ক্রোধ, একবার লোভ, একবার প্রীতি প্রবল বেগে আকর্ষণ করিতে থাকে, কোন দিকে যাইবে স্থির করিতে না পারিয়া যুবা দিশা হারা হয় ও অবশেষে বলবান বৃত্তিবিশেষের একান্ত অধীন হইয়া আত্মহারা হয়। পরে প্রৌঢ়কালে শিশু সন্তান ও বৃদ্ধ পিতা মাতার প্রতিপালন এবং সামাজিক নিয়মরক্ষা প্রভৃতির ভার স্কন্ধে পতিত হয়; তখন মানবকে সমস্ত সুখ বিসর্জন দিয়া ঐ সকল ভারবহনের চেষ্টা করিতে হয়। শেষে বৃদ্ধকালে দন্তের যাতনা, রূপ

কেশের কণ্ডূয়ন, কার্য্যে অসামর্থ্য, দর্শন শক্তি ও শ্রবণশক্তির অল্পতা প্রভৃতি বিবিধ কষ্ট উপস্থিত হয় এবং পুত্রাদির একান্ত অধীনতা জন্য বহু দুঃখ ভোগ করিতে হয়। বৃদ্ধকালে মানবের কোনও প্রকার ভোগ সুখই থাকে না বলিলেই হয়। সর্ব্বশেষে মানবের পরম কষ্টকর মৃত্যুকাল। যদি সুখভোগই আমাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য হয়, তবে মৃত্যুর তুল্য কষ্টকর অবস্থা মানবের আর নাই বলিতে হইবে। কেন না যে শরীর ও জীবন রক্ষার জন্য আজীবন এত কষ্ট করিয়াছি, সেই সাধের শরীর—সেই কাম্য জীবন আজি এককালে যাইবে, এত যত্ন করিয়া যে অট্টালিকা নির্ম্মাণ করিয়াছি, চির-জীবন কষ্ট করিয়া যে সম্পত্তি উপার্জ্জন করিয়াছি তৎসমস্তই আজি চিরকালের মত হারাইতেছি, প্রিয়তম পুত্র, প্রাণাধিকা স্ত্রী, প্রাণপ্রতিম বন্ধু সকলকেই ফেলিয়া—সকল সুখের আশায় জলাঞ্জলি দিয়া আমাকে আজি একাকী কোন্ অপরিচিত ভয়ঙ্কর স্থানে যাইতে হইবে, অথবা আজি আমার সাধের অস্তিত্বের লোপ হইবে—আমি শূন্যে পরিণত হইব—একমাত্র কাঙ্ক্ষণীয় ও মুখ্য উদ্দেশ্য সুখ আজি হইতে আমাকে এককালে পরিত্যাগ করিল, এই ভয়ানক ভাবনায় শরীর মন নিতান্ত অবসন্ন হয়, তৎসঙ্গে রোগের ভয়ানক যন্ত্রণা ও শ্বাসের অদম্য কষ্ট একান্ত ব্যথিত করিতে থাকে। এই নিদারুণ মৃত্যু যন্ত্রণা কেবল প্রাচীন কালেই উপস্থিত হয় না। বাল্য যৌবন সকল সময়েই ঐ ভয়ানক যন্ত্রণার আশঙ্কা মানবহৃদয়ে বর্ত্তমান রহিয়াছে; প্রতিদিনই শত শতবার মানব ঐ যাতনার ভয়ে অস্থির হয়। দেশে যখন মহামারী উপস্থিত হয় তখন ত নিয়তই প্রাণ ধুক ধুক করিতে থাকে। স্ত্রীদিগকে আবার এ সকল ভিন্ন গর্ভযন্ত্রণা প্রভৃতিজনিত বহুতর কষ্ট ভোগ করিতে হয়। সন্তান পালন করিবার জন্য রমণীগণকে না করিতে হয় এমন কার্য্যই নাই। অনশন, রাত্রি জাগরণ, বিমূত্র পরিষ্কার, ভারবহন প্রভৃতি অশেষবিধ কষ্টকর কার্য্য না করিলে সন্তান পালন হয় না।

এইরূপ বহুবিধ দুঃখ যখন মানবের স্বাভাবিক অর্থাৎ যখন প্রত্যেক মনুষ্যকেই এই সকল অসম্ভাবী দুঃখ ভোগ করিতে হয়, তখন কি প্রকারে বলিব মানব সুখ ভোগের জন্য সৃষ্ট? যখন এই সকল দুঃখ নিবারণ করিবার শক্তি মানবের নাই, তখন সুখ ভোগই মানবের উদ্দেশ্য এ কথা

কিছুতেই বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন, বিজ্ঞানের সমধিক আলোচনা হইলে ভবিষ্যতে মানব এই সমস্ত দুঃখ দূর করিতে সমর্থ হইবে। যদি তাঁহাদের এই কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সুখভোগের জন্য মানবের সৃষ্টি একথা বলা যায় না। কেন না তাহা হইলে তাঁহাদের ইহাই বলা হইল, যে, যে কালে বিজ্ঞানের পূর্ণ আলোচনায় মানবের এই সকল দুঃখ দূর করিবার উপায় আবিষ্কৃত হইবে, সেই ভবিষ্যৎ কালীন মানবের সুখসাধনই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, এতকাল যে সকল মানব জন্মিল ও জন্মিবে তাহাদের সুখবিধান ঈশ্বরের অভিপ্রেত নয়; প্রত্যুত ইহারা পরবর্ত্তী মানবের সুখের উপায় আবিষ্কার জন্যই সৃষ্ট; ইহারা কেবল সেই ভবিষ্যৎকালীন মানবের জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্র প্রণয়ন করিতেই থাকিবে। সুতরাং তাঁহাদের মতে সেই উন্নতির চরমকালের মানব ভিন্ন অন্য কোন মানবের সুখবিধান ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নয়—সেই উন্নততম নর বা দেবতারই সুখ বিধান উদ্দেশ্য ইহাই বলা হইল। আর ভবিষ্যতে যে মানব এবংবিধ সুখ পাইবে তাহারই বা যুক্তি কোথায়? তুমি কি ভাবিয়াছ মানব ক্রমে উন্নত হইয়া উন্নতির চরমসীমা বিশেষে উপস্থিত হইয়া স্থির থাকিবে? তাহা যদি ভাবিয়া থাক তবে তোমার নিতান্ত ভ্রান্তি হইয়াছে—তাহা হইলে তুমি কিছুমাত্র বিজ্ঞান বুঝ নাই। কেন না পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে কখনও বিশ্বের কোনও পদার্থ স্থির হইতে পারে না, স্থির হইলেই ধ্বংশ হইবে। সুতরাং যাবৎ মানবের কার্য্য থাকিবে তাবৎ হয় উন্নতি নয় অবনতি হইবে, কাযেই পূর্ণতা প্রাপ্তির অবস্থা কল্পনারও অতীত। অতএব সুখভোগই মানবের উদ্দেশ্য একথা নিতান্ত অলীক।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে, তবে আমাদের উদ্দেশ্য কি? কি উদ্দেশ্যে আমরা সৃষ্ট ও কোন্ উদ্দেশ্য সাধন মানসে আমরা কার্য্য করিব? ইহার সূক্ষ্ম অনুসন্ধান অনেক কঠিন বটে, কিন্তু ইহার স্থূল জ্ঞান অতি সহজ। অর্থাৎ কি উদ্দেশ্য সাধন জন্য ঈশ্বর আমাদিগের সৃষ্টি করিয়াছেন তাহা বুঝা আমাদের সাধ্য নহে বটে, কিন্তু তাঁহারই কোনও উদ্দেশ্য সাধন জন্যই যে আমরা সৃষ্ট তাহাতে আর সন্দেহ নাই। আমাদের জন্ম বা আমাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য আমাদের কোনও প্রকার স্বার্থ-সাধন নহে—আমাদের জন্য আমরা জন্ম গ্রহণ করি নাই। যদি আমাদের জন্মের কোন প্রয়োজন

থাকে, তবে সে প্রয়োজন যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন তাঁহারই। সুতরাং আমাদের সমস্ত কার্য্য ঈশ্বরের অভিপ্রায় সাধনের উপযোগী হওয়া আবশ্যক। ঈশ্বরকার্য্য করাই আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য। ঐ যে চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিতেছে, ঐ যে বৃক্ষ ফলভরে অবনত হইয়াছে, ঐ যে পতঙ্গ উর্ণাতন্তু নির্ম্মাণ করিতেছে, ঐ যে গো দুগ্ধ প্রদান করিতেছে, ঐ যে মানব স্ত্রীপুত্রের ভরণপোষণজন্য প্রাণান্ত পরিশ্রম করিতেছে, সকলেই ঈশ্বরের কার্য্য সাধন করিতেছে, কেহই আপনার কার্য্য করিতেছে না। কেন না লৌহাকর্ষণ করিয়া চুম্বকের নিজের কোনও লাভ নাই, বরফে পরিণত হইয়া জলের নিজের কোনও লাভ নাই, সুন্দর পুচ্ছ ধারণ করিয়া ময়ূরের নিজের কোনও লাভ নাই, বুদ্ধির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া মানবের নিজের কোনও লাভ নাই। যে জীব যে শক্তি পাইয়াছে তাহা না পাইয়া যদি অন্যরূপ শক্তি প্রাপ্ত হইত তাহা হইলে কেহ কিছুমাত্র ক্ষতিবোধ করিত না, ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিতেন তাহাই প্রকাশিত করিয়া সে সুখী হইত। অতএব ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সাধন উদ্দেশেই আমাদের কার্য্য করা উচিত। আমাদের নিজের কোন স্বতন্ত্র উদ্দেশ্য নাই।

এক্ষণে এই তর্ক উঠিতে পারে যে, যদি সুখ আমাদের উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরকার্য্যই আমাদের উদ্দেশ্য, তবে কি আমরা সুখের আশা করিব না? কেবল দুঃখই ভোগ করিব? ঈশ্বর কি এমত স্বার্থ-পর যে, তিনি আপনার কার্য্যের জন্য আমাদিগকে দুঃখ প্রদান করেন? অপিচ ঈশ্বরের আবার কার্য্য কি? যদি তাঁহার কার্য্য আছে স্বীকার করা যায় তাহা হইলেও, তিনি তাহা আমাদের দ্বারা সম্পন্ন করিয়া লয়েন, নিজে সম্পন্ন করিতে পারেন না, এ কথারই বা অর্থ কি? ঐ সকল কথার মীমাংসা করিবার যথাসাধ্য চেষ্টা করা যাইতেছে।

ঈশ্বরের কোন কার্য্য নাই বলিলে ঈশ্বর আছেনও বলা যাইতে পারে না। কেন না শক্তিপ্রকাশের নামই কার্য্য। কোনও পদার্থ যখন শক্তি প্রকাশ করে তখনই কার্য্য করে বলা যায়। যে পদার্থ কোন কার্য্য করে না, তাহার কোন শক্তি প্রকাশ হয় না—সুতরাং তাহার শক্তি আছে কি না জানিতে পারা যায় না। যাহার যে শক্তি আছে তাহার সে শক্তি অবশ্য প্রকাশিত হইবে, এবং তাহা প্রকাশিত হইলেই তাহার কার্য্য হইল। কার্য্য দেখিয়াই আমরা শক্তির

অনুমান করি। যাহাতে যে কার্য্য দেখি, তাহার সেই শক্তি আছে বলি, যাহার দ্বারা যে কার্য্য হয় না দেখি, তাহার সে শক্তি নাই বলি। সুতরাং ঈশ্বরের কোন কার্য্য নাই বলিলে তাঁহার কোন প্রকার শক্তি নাই বলিতে হয়। কিন্তু যাহার শক্তি নাই তাহার সত্তা কি প্রকারে প্রমাণিত হইবে? যদি আমরা ঈশ্বরের কোন কার্য্য না দেখিতাম তাহা হইলে কখনই তাঁহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতাম না। কার্য্য দেখিয়াই আমরা ঈশ্বরের সত্তা অনুভব করিতেছি। এই বিশ্বই তাঁহার কার্য্য। এই বিশ্বদ্বারাই তিনি প্রকাশিত হইয়াছেন। তাঁহার শক্তির পরিমাণ করিতে পারি না বলিয়া বিশ্বরূপ কার্য্যের তাঁহার উদ্দেশ্য কি তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। কিন্তু তাঁহার যে কোনও প্রকার স্বার্থ নাই তাহা স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। কেন না পরের সুখের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া কেবল আপন সুখের প্রতি দৃষ্টি রাখার নাম স্বার্থপরতা। ঈশ্বরের যখন পর কেহই নাই, তখন তাঁহার কার্য্য কি প্রকারে স্বার্থপরতা-দূষিত হইবে? তিনি ভিন্ন এ জগতে ত আর কাহারও বিদ্যমানতা নাই; তিনি ভিন্ন অন্য সমস্ত ত তাঁহারই সৃষ্ট। বিশেষতঃ সর্ব্বশক্তিমান্ ঈশ্বরের কোন অভাব থাকিতে পারে না। সুতরাং ঈশ্বরের কার্য্য বলিলে তাঁহার কোন প্রকার অভাব-দুঃখ দূর বা কোন প্রলোভনীয় সুখ সম্ভোগ করিবার উপযোগী কার্য্য বুঝাইতে পারে না। সৃষ্টিরক্ষার উপযোগী কার্য্যই বুঝায়—বিশ্বের মঙ্গলবিধায়ক কার্য্য সম্পাদনই তাঁহার একমাত্র লক্ষ্য—তিনি কেবল আমাদেরই হিত সাধন করেন। সুতরাং তাঁহার জন্য আমরা যে কার্য্য করি, তাহা আমাদেরই হিতের জন্য করি, ঈশ্বরের হিতের জন্য নহে। ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিলে বিশ্ব রক্ষিত হয় এবং আমরা সুখী হই। আমাদিগকে দুঃখ দেওয়া তাঁহার অভিপ্রেত নহে, সুখী করাই অভিপ্রেত। কিন্তু আমরা যেরূপ সুখ চাই, সে প্রকার সুখ দান তাঁহার অভিপ্রেত নহে। আমরা বিষয়কে সুখের আশ্রয় মনে করি, কিন্তু বাস্তবিক পদার্থ বা বিষয় সুখদুঃখের কারণ নহে। যেমন আমরা পদার্থসকলকে বিবিধবর্ণবিশিষ্ট দেখি, কিন্তু বাস্তবিক পদার্থের কোন বর্ণ নাই, আলোক বিক্ষেপের প্রকরণ অনুসারে পদার্থ সকলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ প্রতিভাত হয়, সেইরূপ কোন পদার্থই সুখ বা দুঃখ দায়ক নহে, আমাদের গ্রহণের অবস্থা অনুসারে কোন পদার্থ দুঃখকর ও কোন পদার্থ সুখকর বলিয়া বোধ হয়।

পূর্ব্বে একথা একরূপ বুঝান হইয়াছে, পুনরায় কয়েকটী উদাহরণ দ্বারা আর একটু বিশদ করিবার চেষ্টা করা যাইতেছে।

ভাগ্যবানের পুত্র রৌদ্রের উত্তাপকে কষ্টকর বিবেচনা করেন, কিন্তু কৃষকের পুত্রেরা বিনা ক্লেশে সেই রৌদ্রে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের নিকট রৌদ্র কিছুমাত্র কষ্টকর নহে। বিবিধ মস্‌লা ও বহু ঘৃত সমন্বিত পলান্ন ভোজন করিয়া বাবুরা সুখী হয়েন, কিন্তু দরিদ্রের তাহা কিছুমাত্র ভাল লাগে না। কতলোকে পলাণ্ডু ও হিঙ্গুকে অতি দুর্গন্ধ দ্রব্য মনে করেন, এমন কি উহাদের গন্ধ আঘ্রাণে তাঁহাদের বমি উপস্থিত হয়, কিন্তু কত লোকে আবার সেই পলাণ্ডুকে অতি উৎকৃষ্ট ও অতি উপাদেয় খাদ্য মনে করেন। অনেকে ঘৃতকে অতি উৎকৃষ্ট উপাদেয় দ্রব্য বলেন, কিন্তু কত লোক আবার সেই ঘৃতের গন্ধও সহ্য করিতে পারে না; এমত অনেক লোক আছে যে, তাহারা ঘৃত সংযুক্ত ব্যঞ্জনও খাইতে পারে না। পল্‌তা তিক্ত, কচু মুখ ধরে ও লঙ্কা তীব্র এই বলিয়া অনেকে ঐ সকল দ্রব্য খাইতে পারেন না—আবার অনেকে অতি উপাদেয় জ্ঞানে সে সকল ভোজন করে। কতকগুলি লোক তৈলের ও কতকগুলি লোক ঘৃতের অতিপ্রিয়। রাঢ়দেশের লোক অন্ন ভিন্ন এক দিনও খাইতে পারে না। কোন দেশের লোক অন্ন ভিন্ন বাঁচে না ও কোন দেশের লোক অন্ন খাইতে পারে না, রুটি তাহাদের সুপথ্য। মদ্যপান, অহিফেন সেবন ও গাঁজার ধূম পান করিলে মত্ততা জন্মে, কিন্তু কত লোক এক বোতল মদ্যপান ও অর্দ্ধ তোলা পরিমিত অহিফেন সেবন করিয়া ধীরভাবে বসিয়া থাকে। দশ রতি পরিমিত অহিফেন সেবনে মানবের প্রাণ নাশ হয়, কিন্তু কত লোক নিত্য এক তোলা পরিমিত অহিফেন সেবন করিয়া সচ্ছন্দে রহিয়াছে। রৌদ্রে বেড়াইলে, জলে ভিজিলে, দুর্গন্ধময় স্থানে বাস করিলে, আর্দ্র স্থানে শয়ন করিলে, শরীরে হিম লাগাইলে পীড়া হয়, কিন্তু দেখ, কত লক্ষ লক্ষ লোক নিয়ত রৌদ্রবাতাদিতে ভ্রমণ, আর্দ্র স্থানে শয়ন ও জ্বরকারজনক পল্লীতে বাস করিয়াও সুস্থ শরীরে রহিয়াছে। তুমি ভাবিতেছ, মাংস ও নানাবিধ বলকর দ্রব্য বার বার যথেষ্ট পরিমাণে আহার না করিলে শরীর দুর্ব্বল হয়, কিন্তু ঐ দেখ ব্রাহ্মণবিধবাগণ একবার মাত্র শাকান্ন ভোজন করিয়া কেমন বলশালিনী ও সুস্থশরীরা এবং হিন্দুস্থানীয়গণ নিরামিষ মাত্র ভোজন করিয়া কিরূপ বলসম্পন্ন। বিষ্ঠা অতি অশ্রদ্ধেয়

ও পরিত্যজ্য, কিন্তু উহা শূকরাদি কত জীবের উপাদেয় খাদ্য। মৃত্তিকায় কোনও বলকর দ্রব্য নাই; ভোজনে পীড়া হয়; কিন্তু উহাই আবার কত জীবের ও সমগ্র উদ্ভিজ্জ শরীরের পোষণ করিয়া থাকে।

আরও দেখা যাইতেছে একই পদার্থ কখনও দুঃখকর হইতেছে ও কখনও সুখকর হইতেছে। অদ্য যাহা দুঃখকর, কল্য তাহাতে আর দুঃখ থাকে না এবং অদ্য যাহা সুখকর কল্য তাহাতে আর সুখ থাকে না। প্রথমে পলাণ্ডু খাইতে অত্যন্ত দুর্গন্ধ বোধ হয়, কিন্তু অভ্যাস করিলে উহার আর সে গন্ধ থাকে না, প্রত্যুত তখন উহাকে অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বোধ হয়। লঙ্কা,তাম্রকূট, চা, অহিফেন, মদ্য প্রভৃতি সমস্তই প্রথম আস্বাদনে অত্যন্ত কটু বোধ হয়, কিন্তু অভ্যাস করিলে কালে অতি উপাদেয় হইয়া পড়ে। সন্দেস বড় মধুর, নিয়ত খাইতে ইচ্ছা হয়, কিন্তু প্রতিদিন যথেষ্ট পরিমাণ ভোজন করিলে সন্দেসের আর সে মধুরত্ব থাকে না; ঐরূপ কোমল শয্যায় শয়ন,অট্টালিকায় বাস, সুগন্ধ দ্রব্য আঘ্রাণ, মধুর সংগীত শ্রবণ প্রভৃতি যাহা যাহা এক সময়ে বড় সুখের উপকরণ বোধ হইয়াছিল কালে সে সকল আর কিছুমাত্র সুখদানে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত সময় বিশেষে প্রভূত কষ্টেরই কারণ হয়। অতএব যখন একই পদার্থ এক সময়ে দুঃখকর ও অন্য সময়ে সুখকর হয় এবং যখন একই পদার্থ একের দুঃখকর ও অন্যের সুখকর হয়, তখন পদার্থের গুণে সুখ দুঃখ জন্মে এ কথা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? বরং এ কথা কথঞ্চিৎ বলা যাইতে পারে যে, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসই সমস্ত সুখ দুঃখের নিদান, তথাপি বিষয়কে সুখ দুঃখের নিদান বলা যাইতে পারে না। কেন না যাহা সাধারণের বিবেচনায় নিতান্ত জঘন্য, প্রবৃত্তি ও অভ্যাসবলে তাহাও অনেকের উৎকৃষ্ট বোধ হয়। মনের শ্রদ্ধার উপর পদার্থের গুণাগুণ এত নির্ভর করে যে, ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। প্রবৃত্তিবলে অতি কুৎসিতা রমণীকেও পরম রূপবতী দেখায়, বিশ্বাসপ্রভাবে অতি সামান্য ঔষধও অতি উৎকট রোগ আরাম করিতে সমর্থ হয়। অতএব এই বিষয় সুখের হেতু, ইহা পাইলে সুখী হইব, এরূপ বিবেচনায় বিষয়লোভে মত্ত হওয়া উচিত নহে। কোন এক নির্দ্দিষ্ট বিষয় সুখ বা দুঃখের হেতু নহে।

ঈশ্বর যে সমস্ত পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছেন তাহার কিছুই নিন্দনীয় নহে, সমস্তই প্রয়োজনীয়। বিষ হইতে অমৃত পর্য্যন্ত সমস্ত পদার্থই বিশ্বের কোন

না কোন কার্য্য সক্ষম করিতেছে। যাহাকে আমরা অতি অপকারী ভাবি তাহাতেও অনেক গুণ দেখা যায়। প্রাণঘাতক বিষ রোগ বিশেষে প্রাণরক্ষার অতি চমৎকার ঔষধ, নিকৃষ্টপ্রবৃত্তি কাম সৃষ্টি রক্ষার একমাত্র উপায়। ঈশ্বরের কার্য্যে ঈশ্বরানুমত রূপে ব্যবহার করিলে বিষও অমৃত হয় এবং কামও বহু কল্যাণপ্রসূ হয়। কিন্তু স্বার্থ সাধন মানসে ব্যবহার করিলে অমৃতও বিষ হয় এবং দয়াও কুফলপ্রসূ হয়। এই জন্য স্বার্থসাধন মানসে কোন কার্য্য না করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত সাধন মানসে কার্য্য করা আমাদের উচিত। সেইরূপ কার্য্য আমাদের মঙ্গলজনক ও প্রকৃত সুখ বিধায়ক। একটী সংস্কৃত শ্লোক আছে (সেটী স্মরণ হইতেছে না) তাহার মর্ম্ম এই যে, পায়ে ধুলা না লাগিতে পারে এই অভিপ্রায়ে যদি পৃথিবীকে চর্ম্মমণ্ডিত করিয়া তদুপরি ভ্রমণ করিবার ইচ্ছা করা যায়, তাহা হইলে সে ইচ্ছা কখনই পূর্ণ হয় না, কিন্তু যদি জূতা পরিয়া সর্ব্বত্র ভ্রমণ করা যায়, তাহা হইলে পৃথিবীকে চর্ম্মাবৃত করার ফললাভ হয়। সেইরূপ জগতের সমস্ত লোক ভাল হইবে সকল পদার্থই আমাকে সুখী করিবে এরূপ চেষ্টা অসম্ভব, আপনি ভাল হইলে, আপনি সন্তুষ্ট থাকিলে সকলকেই ভাল দেখা যায়। এবং সকলে আমাকে ভাল বাসিতেছে বুঝা যায়। বাস্তবিক আপনি ভাল হইলে—আপনি সন্তুষ্ট হইলে সকল পদার্থ ও সকল অবস্থাই সুখের হয় ও আপনি মন্দ হইলে সকল পদার্থ ও সকল অবস্থাই দুঃখের হয়।

সুখের জন্য ব্যস্ত হইলে কখনও সুখ পাওয়া যায় না। কারণ বিষয় ভোগ সুখের হেতু নহে। যত ভোগ করা যায়, ততই ভোগের লালসা বৃদ্ধি হইতে থাকে। যদি মানব কার্য্যচেষ্টাকে সুখকর মনে না করিত, তাহা হইলে কোনও ব্যক্তি এক দিনের জন্যও সুখী হইতে পারিত না। উপভোগদ্বারা কখনও কাহাকেই তৃপ্ত হইতে দেখা যায় নাই। মানুষ চেষ্টা করিয়াই সুখী—কার্য্য করিয়াই সুখী; কাঙ্ক্ষিত ফললাভ করিয়া সুখী নয়। যদি ফললাভে সুখী হইত, তবে ঐ যে দরিদ্র দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়া অর্দ্ধ মুদ্রামাত্র প্রাপ্ত হইয়া সুখলাভ করিল কিন্তু ঐ ধনীর গৃহে উক্তরূপ লক্ষ অর্দ্ধ মুদ্রা সঞ্চিত থাকিলেও সে সুখী নহে কেন? যদি মুদ্রালাভই ঐ দরিদ্রের সুখের কারণ হয়, তবে ঐ ধনী অবশ্য ঐ দরিদ্র অপেক্ষা লক্ষ গুণে সুখী হইবে। কিন্তু বাস্তবিক কি ধনী প্রভূত ধনের অধিকারী বলিয়া বড় সুখী? কখনই

না। আবার দেখ লোকে দরিদ্রদিগকে ধন দান করিয়া কত সুখ অনুভব করিতেছে। যদি মুদ্রাধিগমই সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে মুদ্রাত্যাগে কখনও সুখ হইত না—দুঃখই হইত। কিন্তু বাস্তবিক কি ধনের সঞ্চয় অপেক্ষা ধনের দানে অধিক সুখলাভ হয় না? আমাদের বোধ হয় দানে যে পরিমিত সুখলাভ হয় সঞ্চয়ে তাহার সামান্য কণা পরিমিত সুখলাভও হয় না। অতএব আমরা ফল প্রাপ্তে সুখী নহি, কার্য্য করিয়া সুখী— ঈশ্বরদত্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সুখী। এই জন্য শ্রমজীবীরা দিবারাত্রি পরিশ্রম করিয়াও সুখী এবং ধনীরা আলস্যে সময় অতিবাহন করিয়া দুঃখী। যে যত কার্য্যে রত সে তত দুশ্চিন্তাশূন্য এবং যে যত কার্য্যশূন্য সে তত দুশ্চিন্তারত। দুশ্চিন্তা যে কত ক্লেশকর তাহা বোধ হয় কাহাকেও বুঝাইয়া দিতে হইবে না। ফলভোগ যে সুখের কারণ নহে তাহা রাসেলাসের বিবরণ পাঠেও জানা যায়। সুখের সমস্ত উপকরণই রাসেলাসের ছিল, কোন অভাবই তাঁহাকে ব্যথিত করিতে পারিত না—যে সকল বিষয় লাভের জন্য মানব নিয়ত চেষ্টা ও পরিশ্রম করে, তাহার সমস্ত উপকরণই রাসেলাসের ছিল। কিন্তু কিছুতেই তাঁহাকে সুখী করিতে পারে নাই। তিনি নিয়তই চিন্তা করিতেন এবং বলিতেন কি পাইলে আমি সুখী হইব তাহা যদি জানিতে পারি, তাহা হইলে তাহার চেষ্টা করিতে পারি, চেষ্টা করিতে পারিলে, অন্ততঃ চেষ্টা করিতেছি ভাবিয়াও সুখী হই। পরিশেষে রাসেলাস পৃথিবীর সর্ব্বত্রই সুখের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিলেন, সকল সম্প্রদায়ের লোকের সহিত মিশিলেন কিন্তু কোনও স্থানেই সুখ দেখিতে পাইলেন না; অর্থাৎ বিষয়ফল ভোগ করিয়া সুখী হইয়াছে এমত লোক কোথাও দেখিতে পাইলেন না। বাস্তবিক মানব ফললাভ করিয়া সুখী নহে, কার্য্য করিয়াই সুখী।

অনেকে বিপরীত বুঝিয়া থাকেন, অর্থাৎ তাঁহাদের মতে কার্য্য করার নাম খাটা, খাটা বড় কষ্টকর, ফলাধিগমই সুখেরই হেতু। কিন্তু বাস্তবিক যদি চেষ্টাজনিত শ্রম কষ্টের কারণ ও ফলস্বরূপ অর্থ সুখের কারণ হইত, তাহা হইলে কখনই ধনিসন্তানগণ অনাবশ্যক ধনবৃদ্ধির চেষ্টা রূপ কার্য্য করিয়া বৃথা দুঃখভোগ করিতেন না, অধিকৃত ধন দ্বারাই সুখভোগ করিতেন। কিন্তু বাস্তবিক ধনে সুখ হয় না বলিয়াই তাঁহারা কার্য্যদ্বারা সুখলাভ

করিবার অভিপ্রায়ে ধনবৃদ্ধির চেষ্টা করেন, এবং সেই জন্যই সকল মানব চেষ্টিত কার্য্যের সমান ফল প্রাপ্ত হয় না। অর্থাৎ কেহ অজস্র চেষ্টা করিয়াও সামান্য ফল প্রাপ্ত হয় এবং কেহ বিনা চেষ্টায় প্রভূত ফললাভ করে—একজন ভয়ানক পরিশ্রম করিয়া দশটী টাকাও পায় না আর একজন পিতার উপার্জ্জিত লক্ষাধিক মুদ্রা প্রাপ্ত হয়। অতএব কার্য্যই আমাদের সুখবিধায়ক, ফল নহে। ফল ফলিল কি না আমাদের তাহা দেখিবারই আবশ্যকতা নাই। কেন না পূর্ব্বেই সপ্রমাণ হইয়াছে আমরা যে সকল কার্য্য করি তৎসমস্তই ঈশ্বরের কার্য্য; সুতরাং আমাদের কার্য্যের যে ফললাভ হয় তাহাও ঈশ্বরের। কার্য্য করা মাত্র আমাদের কার্য্য, তাহাই আমরা করিতে পারি, ফল ফলাইবার শক্তি আমাদের নাই। ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা করিতে বলিয়াছেন তাহা করিলেই আমাদের কার্য্য সম্পন্ন হইল। সে কার্য্যের যে ফল ফলান তাঁহার অভিপ্রেত, তাহা তিনিই ফলাইবেন। অতএব কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়া উদ্দিষ্ট ফল না ফলিলে আমাদের দুঃখিত হওয়া উচিত নহে, ঠিক ঈশ্বরের অভিপ্রায়ানুরূপ কার্য্য করা হইয়াছে কি না তাহাই মাত্র আমাদের বিবেচ্য। যদি তাহা করা হইয়া থাকে তাহা হইলেই আমাদের কর্ত্তব্য করা হইয়াছে এবং তাহা হইলে আমরা নিশ্চয়ই সুখী হইব।

আমরা ফলভোগের আশা করিব না, সুখকামনা করিব না, অথচ কার্য্য করিব, এ কথা শুনিয়া হয় ত অনেকে হাসিয়া উঠিবেন। তাঁহারা হয় ত বলিবেন, যদি ফলকামনাশূন্য হইলাম—যদি সুখের আশা না করিলাম, তবে কার্য্য করিব কেন? কার্য্য করিয়া সুখী হইতে পারিলেও কার্য্য করিতে আমাদের প্রবৃত্তি হইবে কেন? ফললাভ—সুখলাভ কামনাই কি কার্য্য-প্রবর্ত্তনার একমাত্র হেতু নহে? সেই মূল কারণের যখন অভাব হইল, তখন কার্য্য হইবে কেন? প্রথমতঃ ইচ্ছা, পরে চেষ্টা ও কার্য্য। কিন্তু ইচ্ছা কিসের? ফললাভের ও সুখ লাভের কি ইচ্ছা নহে? ঐ দরিদ্র যে এত পরিশ্রম করিতেছে, উদরপূর্ত্তি ও পরিবার প্রতিপালন জনিত সুখলাভ চেষ্টা যদি উহার অভীষ্ট না হইত, তাহা হইলে কি ঐ ব্যক্তি এত পরিশ্রম করিত? আর ঐ যে কেরাণি বাবু আফিসে মনিবের নিকট হইতে অযথা গালি খাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বাটী আসিতেছেন, যদি উক্তরূপ সুখলাভ

বা সুখের অভাব জনিত দুঃখ উহাকে ব্যথিত না করিত, তাহা হইলে কি আর কল্য ঐ ব্যক্তি পুনর্ব্বার আফিসে কার্য্য করিতে যাইত? কখনই নহে। অতএব ভোগ্য ফলের আশা না করিয়া কার্য্য করা নিতান্ত অসম্ভব। কোন উদ্দেশ্য না থাকিলে মানব কি কার্য্য করিবে? বসিয়া বসিয়া হাত পা নাড়িলেই কি কার্য্য করা হয়? তাহা যদি না হয়, তবে কর্ত্তব্য অকর্ত্তব্য বুঝিব কি প্রকারে? যদি নির্দ্দিষ্ট ফলকামনা না থাকে, তবে যাহা তাহা করিলেই ত আমাদের কর্ত্তব্য করা হইবে। বসিয়া বসিয়া হাত পা নাড়িলেও কার্য্য করা হইবে, ধনরত্ন জলে নিক্ষেপ করিলেও কর্ত্তব্য করা হইবে, মনুষ্যের কণ্ঠচ্ছেদন করিলেও কর্ত্তব্য করা হইবে, কোন কার্য্যই অকর্ত্তব্য হইবে না।

আমাদের বোধ হয়, এরূপ সন্দেহ করিবার কোন কারণই নাই। কেন না আমরা এমন কথা বলি নাই, যে আমাদের কার্য্যের কোনই উদ্দেশ্য নাই। আমরা ইহাই বলিয়াছি যে, স্বার্থ বা সুখসাধন আমাদের কার্য্যের উদ্দেশ্য নয়, ঈশ্বরের কার্য্য বা বিশ্বকার্য্য সাধন করাই আমাদের কার্য্যের প্রকৃত উদ্দেশ্য। সুতরাং আমাদের কার্য্য উদ্দেশ্যশূন্য হইতেছে না। ঈশ্বরাভিপ্রেত উদ্দেশ্যসাধনের উপযোগী কার্য্য আমাদিগকে করিতে হইবে। যাহা তাহা করিলে ঈশ্বরের অভিপ্রেত কার্য্য সাধিত হয় না, সুতরাং যাহা তাহা করিলে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয় না। সমস্ত কার্য্যই ঈশ্বরাভিপ্রেত সাধনের উপযোগী হওয়া আবশ্যক, সুখ কামনায় কার্য্য না করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত সাধনমানসে কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মিষ্টান্ন বড় সুখাদ্য ও সুখকর এই ভাবিয়া সুখী হইবার জন্য মিষ্টান্ন খাওয়া কর্ত্তব্য নহে। আমাদের শরীরের স্বাস্থ্য বিধান জন্য পরমেশ্বর মিষ্ট ভোজনের ব্যবস্থা করিয়াছেন, অতএব তদুপযোগী মিষ্টান্ন ভোজন করা উচিত, এই বিবেচনায় পরিমিত মিষ্টান্ন ভোজন করিতে হইবে। কামরিপু চরিতার্থ করিলে সুখলাভ হয় এ বিবেচনায় স্ত্রী গ্রহণ করিব না, সৃষ্টি রক্ষার জন্য স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন আবশ্যক এই বিবেচনায় পরিমিত রূপে স্ত্রী সহবাস করিব। এইরূপে কর্ত্তব্য সম্পাদন অভিপ্রায়ে কার্য্য করিতে পারিলেই আমরা প্রকৃত সুখী হইতে পারি। সুখ সাধন মানসে কার্য্য করিলে সুখ হয় না, তাহাতে দুঃখেরই বৃদ্ধি হয়। কেন না ঈশ্বরাভিপ্রেত শরীররক্ষার জন্য ভোজন আবশ্যক এ

বিবেচনায় ভোজন করিলে, যে দ্রব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে শরীর সুস্থ থাকে, তাহাই ভোজন করিয়া সুখী হওয়া যায়। আর যদি ক্ষুধা নিবারণ বা ভোজনসুখ লাভ করিবার জন্য ভোজন করিতে হয়, তাহা হইলে অস্বাস্থ্যকর দ্রব্যে উদর অতিমাত্র পূর্ণ করিয়া পীড়িত বা গতাসু হইতে হয়। অতএব যখন ঈশ্বরাভিমত কার্য্য করিলেই আমরা সুখী হইব, তখন সুখের স্বতন্ত্র প্রার্থনা করার কিছুমাত্র আবশ্যকতা নাই, প্রত্যুত স্বতন্ত্র সুখের প্রার্থনা বা ফলাকাঙ্ক্ষা দুঃখেরই কারণ। কেন না আমরা সকল কার্য্যের প্রার্থনানুরূপ ফললাভ করিতে পারি না; সুতরাং ফল বিশেষ লাভের প্রত্যাশা করিয়া বিফল মনোরথ হইলে আমাদিগকে দারুণ মনস্তাপ পাইতে হয়—প্রার্থনীয় সুখের পরিবর্ত্তে বৃথা দুঃখভোগ করিতে হয়। সুখের উদ্দেশে কার্য্য করিলাম আর ফল পাইলাম দুঃখ। এ বিড়ম্বনা কেন? সুখের জন্য যে কার্য্য করিলাম, তাহা সফল হইল না, না হয় সুখই পাইলাম না, কিন্তু দুঃখভার বহন করিব কেন? কার্য্য করিলাম সুখের জন্য, ফল পাইলাম দুঃখ, ইহা কি নিতান্ত অন্যায় নহে? সুখলাভে সফল না হইলাম সুখই হইল না, কিন্তু তাহা বলিয়া দুঃখ পাইব কেন? নিরাশা জনিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হইব কেন? অতএব সুখলাভ প্রত্যাশায় কার্য্য কর্ত্তব্য নহে, উহা আমাদের কার্য্যের প্রবর্ত্তকও নহে; ঈশ্বরকার্য্য সাধন করাই আমাদের কার্য্য প্রবৃত্তির প্রকৃত কারণ। ঐরূপ কার্য্যই আমাদের সুখের হেতু। উহাতে প্রার্থনা ভঙ্গ জনিত দুঃখ নাই, দুঃখসংস্রব শূন্য নির্ম্মল সুখই উহার ফল। অন্ততঃ এই বিমল সুখের জন্য মানব কার্য্য করিবে।

তুমি বলিতে পার, মানব যে কার্য্য করিয়া সুখী হয়, সে কেবল ফল পাইবার আশা আছে বলিয়া। স্বয়মাগত ফলদ্বারা সুখ না হউক, কিন্তু কার্য্যলব্ধ ফলে সুখলাভ হয়, অর্থাৎ কেবল মাত্র ফলদ্বারা সুখ হয় না বটে, কিন্তু কার্য্য ও ফলের সমবায়ে প্রকৃত সুখ হয়। কার্য্যশূন্য ফলদ্বারা যেমন সুখ হয় না, সেইরূপ ফলশূন্য কার্য্য দ্বারাও সুখ হয় না। তবে যে ফলহীন কার্য্য করিবার সময়েও আমরা দুঃখ বোধ করি না সে কেবল ফল লাভের আশা আছে বলিয়া। যদি পূর্ব্বেই জানা যাইত যে কার্য্য সফল হইবে না, তাহা হইলে কখনই কার্য্যে করিবার সময়ে সুখলাভ হইত না। অতএব সুখ কামনাশূন্য কার্য্য কখনই সুখের কারণ হইতে পারে না।

যদি এ সকল কথা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলেও সুখকামনার আবশ্যকতা নাই। কেন না ঈশ্বরের নিয়ম এই যে, কার্য্য করিলেই তাহার ফল ফলিবে—কামনা করিলেও ফলিবে, কামনা না করিলেও ফলিবে। সুতরাং কামনা বা ফললাভের আশা কার্য্যের সহিত নিয়ত বর্ত্তমান (Inherent) রহিয়াছে। এই জন্য কেহ ক্ষণমাত্রও কার্য্য শূন্য হইয়া থাকিতে পারে না। তবে যে তুমি সকল কার্য্যের ফল দেখিতে পাও না, তাহার কারণ এই যে, তুমি আম্র বীজ রোপণ করিয়া নারিকেল ফল পাইবার কামনা কর। কিন্তু তাহা একান্ত অসম্ভব। কার্য্য যেরূপ হইবে, ফল তাহারই অনুরূপ ফলিবে, তোমার ইচ্ছামত ফল হইবে না। আম্রবীজ রোপণ করিলে যেমন তাহাতে নারিকেল বৃক্ষ জন্মে না ও অগ্নির তাপ গাত্রে লাগাইলে যেমন গাত্র শীতল হয় না, সেইরূপ অনুষ্ঠিত কার্য্যের অনুপযোগী সুফল কামনা করিলে, সে কামনা নিশ্চয়ই নিষ্ফল হইবে। অর্থাৎ তুমি নির্দ্দিষ্ট পদার্থ বা পদ পাইবার জন্য তাহার অনুপযোগী কার্য্য করিলে তোমার কামনা কখন সফল হইবে না। যাহার যেরূপ অবস্থা, যেমন শক্তি, যেমন কাল, যেমন দেশ, যেমন সমাজ সে তদুপযোগী কার্য্যের ফললাভ করিতে পারে কিন্তু তাহার অতিরিক্ত ফল প্রার্থনা করিলে সে ফল পাইবে না, অধিকন্তু তাহাকে অনধিকারচর্চ্চা ও নিরাশাজনিত দুঃখ পাইতে হইবে। অতএব ফলের দিকে দৃষ্টি না করিয়া উপযোগী কার্য্য করাই উচিত। তাহাতে যে ফল লাভ হইতে পারে, তাহা নিশ্চয়ই ফলিবে। এই জন্য কর্ত্তব্য পরায়ণেরা ফলের প্রতি দৃষ্টি করেন না, কার্য্য করিয়াই সুখী হয়েন— শক্তি ও অবস্থাদির উপযোগী কার্য্য করিয়া যে ফল পান তাহাতেই সুখী হয়েন।

পাশ্চাত্য সভ্যতাভিমানী যুবক দল বলেন যে, যাহার যেমন অবস্থা সে যদি তদনুরূপ ফললাভে সুখী হয়, যদি মানব শক্তির ঔৎকর্ষ লাভের চেষ্টা না করে, তবে মানবের উন্নতি হইবে কেন? তাহা হইলে যে যে অবস্থায় আছে চিরদিনই সে সেই অবস্থায় থাকে, সুতরাং তাহা হইলে আর মানবে ও পশুতে কোন প্রভেদ থাকে না—সভ্যতা, বিদ্যা, জ্ঞান কিছুরই উন্নতি হয় না।

আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। কেন না ফল লাভ না

হইলে দুঃখ করিলে আমাদের উন্নতি হইবে, এ কথার অর্থ কি? উন্নতি কি কাঁদিয়া হইবে? না কার্য্য করিয়া উন্নতি হইবে? অবশ্য বলিতে হইবে যে, উন্নতি কার্য্য দ্বারাই হইয়া থাকে, ক্রন্দন দ্বারা হয় না। তাহা যদি হইল, তবে না কাঁদিলে উন্নতি হইবে না কেন? বরং না কাঁদিয়া—না বিরক্ত হইয়া নিয়ত কার্য্য করিলে যে অধিকতর উন্নতি হইবে। কেন না যদি কার্য্য করিয়া অভীপ্সিত ফললাভ না হইলে দুঃখে ম্রিয়মাণ হইতে হয়, তাহা হইলে পরে কার্য্য করিবার ব্যাঘাত জন্মে এবং পুনঃপুনঃ কার্য্যনিষ্ফলতা জন্য দুঃখ করিলে শেষে কার্য্যের প্রতি এমন অনাস্থা জন্মে যে, কার্য্য করিতে আর প্রবৃত্তিই হয় না। কিন্তু নিষ্ফল হইলে যদি দুঃখ না করা যায়, তাহা হইলে ভবিষ্যৎ কার্য্যের কোনও ব্যাঘাতই ঘটে না—সমান উৎসাহের সহিত চিরজীবন কার্য্য করা যায়। যাহাদের অন্য কোন লক্ষ্য নাই, কেবল কর্ত্তব্য কার্য্যসাধনই যাহাদের একমাত্র লক্ষ্য নিয়ত কার্য্য করিতে করিতে তাহাদের অধিকতর পটুতা জন্মে ও ক্রমে শক্তির উৎকর্ষ হইতে থাকে। অতএব নিষ্কাম কর্ম্ম উন্নতির ব্যাঘাতক নহে, প্রত্যুত উহাই উন্নতির একমাত্র হেতু। তবে এ প্রণালীতে কার্য্য করিলে অস্বাভাবিক উন্নতির কিছু বাধা ঘটে, অর্থাৎ যেরূপ উন্নতি করিলে অন্যের অবনতি হয়, যেরূপ উন্নতি করিলে সাধারণের কষ্ট বৃদ্ধি হয়, পাশ্চাত্য সভ্যতাপরায়ণগণের সেইরূপ উন্নতির ব্যাঘাত হয়। কিন্তু সে উন্নতি বাস্তবিক উন্নতি নহে। যেরূপ উন্নতি হইলে সকলেরই সর্ব্ব প্রকারে উন্নতি হইতে পারে এবং যেরূপ উন্নতি হইলে তদ্দ্বারা পরের বা আপনার কোন বিষয়েই অবনতি না হয়, তাহাই প্রকৃত উন্নতি পদবাচ্য। পাশ্চাত্য সভ্যতাপরায়ণগণের উন্নতি সেরূপ নহে। পরস্বাপ-হরণ করিয়া ধনী হওয়া যেরূপ উন্নতি, তাহা সেইরূপ উন্নতি। তাহা ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, সুতরাং কর্ত্তব্যও নহে। অতএব কার্য্য-সাফল্যে উচ্চহাস্য ও কার্য্য বৈফল্যে ক্রন্দন না করিলে প্রকৃত উন্নতির ব্যাঘাত হয় না, বরং অধিকতর উন্নতিই হয়। চেষ্টা করিয়া অন্ন পাইলাম না বলিয়া দুঃখ করিলে বা কাঁদিলে কি শরীর রক্ষিত হইবে? না তদ্দ্বারা ক্ষুধা নিবারিত হইবে? তাহা যখন হইবে না, তখন বৃথা ক্রন্দন করিয়া ফল কি? বরং যে সময়ে তুমি ক্রন্দন করিবে, সেই সময়ে পুনরায় অন্ন পাইবার চেষ্টা করিলে কার্য্য হইবে। তোমার অবস্থা ও শক্তি প্রভৃতির অনুরূপ চেষ্টা হয় নাই বলিয়াই

তুমি অন্ন পাও নাই, এই বিবেচনায় পুনরায় ধীর ভাবে চিন্তা করিয়া কর্ত্তব্য অনুষ্ঠানে যত্ন কর, অবশ্য ঈশ্বরাভিপ্রেত ফল পাইবে। যদি বার বার চেষ্টা করিয়াও ফল না পাও তাহা হইলেও ক্রন্দন বা দুঃখ বোধ করা উচিত নহে। কেন না কাঁদিলে ত ফল পাইবে না, যতক্ষণ দেহে জীবন থাকিবে, বৈধ চেষ্টা করিতে হইবে। তাহাই মাত্র তোমার ক্ষমতা, তদরিক্ত আর কিছুই করিবার তোমার শক্তি নাই। পরমেশ্বর তোমাকে কার্য্য করিবার শক্তিই দান করিয়াছেন, ফল ফলাইবার স্বতন্ত্র শক্তি দেন নাই। ভগবান্ বাসুদেব বলিতেছেন—

কর্ম্মণ্যেবাধিকারস্তে মাফলেষু কদাচন।
মা কর্ম্ম ফলহেতুর্ভূর্ম্মা তে সঙ্গোস্ত্বকর্ম্মণি।

ভগবদ্গীতা ২। ৪৭।

সুতরাং যদি প্রার্থনানুরূপ কার্য্যকরণোপযোগী শক্তি প্রভৃতি তোমার না থাকে, তাহা হইলে কি ক্রন্দন কি চেষ্টা কিছুতেই তোমার অভীষ্ট লাভ হইবে না।

এক্ষণে এই তর্ক উত্থিত হইতে পারে যে, যখন প্রমাণ হইল সমস্ত বিষয় ও সমস্ত শক্তি ঈশ্বরের স্বষ্ট ও সুখ দুঃখ বিষয়গত নহে, তখন অবশ্য কোন বিষয় বা কোন কার্য্যই মন্দ হইতে পারে না এবং আমরা যে কোন বিষয় অবলম্বন করিয়া যে শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিব তাহাতেই আমাদের সুখ লাভ হইবে। তবে ভাল মন্দ ও পাপ পুণ্য ভেদ কেন? যখন আমরা ঈশ্বরেরই প্রদত্ত শক্তি অনুসারে ঈশ্বরেরই নিয়মানুযায়ী কার্য্য করি, তখন কেহ নিন্দিত কেহ প্রশংসিত এবং কেহ পাপী কেহ পুণ্যবান বলিয়া অভিহিত হয় কেন? ঈশ্বরের স্বষ্টির মধ্যে আবার ভাল মন্দ কি? যদিও ভাল মন্দ থাকে, তাহা যখন ঈশ্বরেরই প্রদত্ত শক্তি অনুসারে ও তাঁহারই কৃত নিয়মানুসারে সম্পন্ন করি, তখন তাহার নিন্দা প্রশংসা এবং পাপ পুণ্যের ভাগী আমরা হই কেন? যত নিন্দা, যত প্রশংসা, যত পাপ, যত পুণ্য, যত সুখ, যত দুঃখ সমস্ত ঈশ্বরেরই হওয়া উচিত। আমরা ঈশ্বরের যন্ত্র বিশেষ মাত্র, তিনি যেমন করান তেমনি করি। সুতরাং আমাদের আবার দায়িত্ব কি? আবার যদি বাস্তবিক আমাদের কোন দায়িত্ব না থাকে, তবে আর মানবে ও পশুতে ভেদ কি থাকে এবং তাহা হইলে আর মানবের জ্ঞান লাভেরই বা আবশ্যকতা কোথায়?

আমদের বোধ হয় একটু অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করিয়া দেখিলে অনায়াসে এ সকল সন্দেহ নিরাকৃত হইবে। কেন না পরমেশ্বর সকল পদার্থ সৃষ্টি করিয়াছন বলিয়া ভাল মন্দ নির্বাচন করিতে হইবে না, এ কথা বলা যাইতে পারে না। সত্য বটে, নিরপেক্ষ ভাল মন্দ কিছুই জগতে নাই, কিন্তু সকলেরই আপেক্ষিক ভাল মন্দ আছে। বিষ্ঠা ও অন্ন উভয় পদার্থই ঈশ্বরের সৃষ্ট এবং উভয় পদার্থই বিশ্বের কোন না কোন কার্য্যে প্রয়োজনীয়, এই জন্য নিরপেক্ষভাবে ঐ উভয় পদার্থকেই ভাল বলিতে হইবে। কিন্তু ঐ উভয় পদার্থকে যখন ভোজ্য শ্রেণীর অন্তর্গত করিতে হইবে, তখন বিষ্ঠা শূকরের পক্ষে ভাল হইবে, কিন্তু মানবের পক্ষে মন্দ হইবে। অন্ন মানবের পক্ষে ভাল হইবে, কিন্তু ব্যাঘ্রের পক্ষে মন্দ হইবে। ঈশ্বর সকল পদার্থ ও সকল বিষয় সকলের উপযোগী করেন নাই। যাহা যাহার উপযোগী করিয়াছেন, তাহা তাহার পক্ষে ভাল এবং যাহা যাহার অনুপযোগী করিয়াছেন তাহা তাহার পক্ষে মন্দ। যাহা উদ্ভিদের উপযোগী তাহা প্রাণীর উপযোগী নহে, যাহা ইতর প্রাণীর উপযোগী তাহা মানবের উপযোগী নহে, যাহা মানবের উপযোগী তাহা উদ্ভিদ ও ইতর প্রাণীর উপযোগী নহে। যাহা বাল্যকালের উপযোগী তাহা যৌবনকালের উপযোগী নহে, যাহা যৌবনকালের উপযোগী তাহা বৃদ্ধকালের উপযোগী নহে, যাহা ইংলণ্ডের উপযোগী তাহা ভারতের উপযোগী নহে, যাহা ভারতের উপযোগী তাহা ইংলণ্ডের উপযোগী নহে। যাহা শত বর্ষ পূর্ব্বে উপযোগী ছিল তাহা এক্ষণে উপযোগী নহে, যাহা এক্ষণে উপযোগী তাহা শত বর্ষ পরে উপযোগী হইবে না। যাহা সুস্থ ব্যক্তির উপযোগী তাহা পীড়িতের উপযোগী নহে, যাহা পীড়িতের উপযোগী তাহা সুস্থের উপযোগী নহে। যাহা সভ্যের উপযোগী তাহা অসভ্যের উপযোগী নহে, যাহা জ্ঞানীর উপযোগী তাহা মূর্খের উপযোগী নহে। যাহা বিনীতের উপযোগী তাহা ক্রোধপরায়ণের উপযোগী নয়। যাহা ক্রোধ পরায়ণের উপযোগী তাহা বিনীতের উপযোগী নহে। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থা ভেদে বিষয়ের উপযোগিতা—অভ্যাসের সহিতও উপযোগিতার সম্বন্ধ আছে। আবার উপযোগী বিষয়ের পরিমাণের তারতম্য নির্দ্দিষ্ট আছে। কোন বিষয় অল্প পরিমিত হইলে উপযোগী হয় ও কোন বিষয়

অধিক পরিমিত হইলে উপযোগী হয়। যাহা একের অল্প পরিমাণ উপযোগী তাহা অন্যের অধিক পরিমাণ উপযোগী। এক ব্যক্তিরই কখন কোন বিষয় উপযোগী ও কখন কোন বিষয় অনুপযোগী হয় এবং কখন কোন বিষয় অল্প পরিমাণ উপযোগী, ও কখন অধিক পরিমাণ উপযোগী। পরমেশ্বর যাহাকে যে অবস্থায় যে পরিমাণে যে বিষয়ের উপযোগী করিয়াছেন, তাহার পক্ষে তাহাই ভাল, তাহা সম্পন্ন হইলেই তাহার ঈশ্বর-কার্য্য ও আপনার সুখ সাধিত হয়। শৈশবকালে স্তন্যই উপযোগী খাদ্য এবং হস্ত পদ সঞ্চালনই উপযোগী কার্য্য—তখন স্তন্যপান ও হস্ত পদ সঞ্চালিত করিলে ঈশ্বরের কার্য্য সম্পন্ন হয়, শিশুরও সুখ জন্মে; অর্থাৎ ঐরূপে শিশু জীবন রক্ষা করিয়া কার্য্য করিবার শক্তি লাভ করিতে থাকে। কিন্তু যৌবনকালে স্তন্য খাদ্য হইতে পারে না এবং হস্ত পদ মাত্র পরিচালনা কার্য্য হইতে পারে না। ঐরূপ অসভ্যগণের মাংস ভোজন ও বন্য পশু শিকার বৃত্তি উপযোগী হইলেও সভ্য মানবের তাহা উপযোগী নহে; যোদ্ধ্‌গণের মদ্য-পান ও হিংসা উপযোগী হইলেও জ্ঞানমার্গাবলম্বী ব্রাহ্মণের তাহা উপযোগী নহে। ব্রাহ্মণ আতপ তণ্ডুল ভোজন ও জ্ঞান চর্চ্চা করিয়াই পরিতৃপ্ত। শিশু, মূর্খ ও অসভ্যগণের বার বার ভোজন আবশ্যক হইলেও উন্নত মানব একবার মাত্র পরিমিত ভোজন করিয়াই তৃপ্ত ও বলিষ্ঠ হয়। পরমেশ্বর যে অবস্থায় যাহাকে যে বিষয়ের উপযোগী করিয়াছেন তাহার তাহাই উপ-যোগী। সুতরাং নিরপেক্ষ ভাবে সকল পদার্থ ও সকল বিষয় ভাল হইলেও সকলের পক্ষে সকল বিষয় ভাল নহে। উপযোগী বিষয় প্রকৃত সুখ দায়ক এবং উপযোগী কার্য্যই ঈশ্বরের অভিপ্রেত, অথবা যাহা যাহার উপযোগী তাহা তাহার পক্ষে ভাল ও পুণ্যজনক, যাহা যাহার উপযোগী নহে তাহা তাহার পক্ষে মন্দ ও পাপজনক।

ঈশ্বর যাহাকে যাহার উপযোগী করিয়াছেন, সে তদনুরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে, অর্থাৎ বিশ্বে যে এই জড় ও অজড়, উদ্ভিদ ও প্রাণী, ইতর জীব ও মানব, পণ্ডিত ও মূর্খ, পাপী ও পুণ্যবান, সভ্য ও অসভ্য, বালক ও বৃদ্ধ প্রভৃতি আখ্যা ভেদ লক্ষিত হয়, উপযোগী বিষয়ের বিভিন্নতাই তাহার প্রধান কারণ ও পরিচায়ক। এক এক প্রাণীর বা এক এক অবস্থার প্রাণীর এক একরূপ বিষয় উপযোগী। যে বিষয় যাহার উপযোগী হওয়া ঈশ্বরের অভিপ্রেত, সে

বিষয় তাহার উপযোগী হইলেই সে তদাখ্যা লাভের উপযুক্ত হয়, বিপরীত হইলে সে তদাখ্যা লাভের যোগ্য নহে। চুম্বক লৌহ আকর্ষণ করিবার উপযোগী। সুতরাং যদি কোন চুম্বক লৌহ আকর্ষণ না করে তবে তাহাকে চুম্বক বলিতে পারা যায় না। ঐরূপ ঈশ্বর মনুষ্যকে যে সকল বিষয়ের উপযোগী করিয়াছেন মনুষ্য যদি সে সকল বিষয়ের উপযোগী না হয়, তাহা হইলে তাহাকে মনুষ্য বলা যাইতে পারে না। সুতরাং অনুপযোগী কার্য্য অর্থাৎ ঈশ্বরাভিপ্রেত পাপ কার্য্য করিলে মনুষ্য নিন্দিত হয়।

ঈশ্বর সকলেরই সৃষ্টিকর্ত্তা বটে, কিন্তু সৃষ্ট পদার্থ ও ঈশ্বর এক নহে। ঈশ্বর ও সমষ্টীভূত বিশ্ব ভিন্ন না হইলেও বিশ্বের অন্তর্গত পদার্থ সকল ও ঈশ্বর এক নহে। তিনি সকলেরই ভিন্ন ভিন্নরূপ প্রকৃতি ও তদনুরূপ ভিন্ন ভিন্ন আত্মা প্রদান করিয়াছেন। সকলকেই প্রকৃতির অনুযায়ী কার্য্য করিবার ও অনুভব করিবার শক্তি প্রদান করিয়াছেন। সুতরাং যে কার্য্য যাহা দ্বারা অনুষ্ঠিত, তাহারই তাহার যোগ্যতাররূপ ফলের অনুভূতি হয়। এই অনুভূতির পার্থক্যই সৃষ্টির মূল। এ পার্থক্য না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না, সমস্তই এক হইয়া যায়। ঈশ্বর ও জীবে এবং আপন ও পরে ভেদজ্ঞান না থাকিলে সৃষ্টি থাকে না। এই জন্য ঈশ্বর সকল প্রাণীকেই সুখ দুঃখ বোধ, যশোনিন্দার ভয়, ইচ্ছা ও কর্ত্তব্যজ্ঞান দিয়াছেন। সুতরাং কর্ত্তব্য করণ জন্য সকলেই দায়ী। এক কথায় ইহা বলিলেই বুঝিতে পারা যাইবে যে, ঈশ্বর সকল পদার্থ ও সকল জীবকেই আপনা হইতে ভিন্ন করিয়াছেন এবং সকলকে স্ব স্ব প্রকৃতির অনুযায়ী সুখ দুঃখাদি জ্ঞান দিয়াছেন, তদনুসারে জীবগণ কৃত কার্য্যের ফল ভোগ করে, ইহাই সৃষ্টির লক্ষণ তদন্যথায় সৃষ্টি অচল হয়, সুতরাং তাহা বিজ্ঞানের একান্ত অবিষয়। আমরা বার বার বলিয়াছি যাহা আছে, তাহাই আমাদের বিচার্য্য বিষয়। যাহা নাই তাহা হইল না কেন, অথবা ঈশ্বর এরূপ না করিয়া ওরূপ করিলেন না কেন, সে বিচার করিবার অধিকার আমাদের নাই, আমাদের বিজ্ঞানেরও নাই। সুতরাং যখন আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি আমাদের সুখ দুঃখ জ্ঞান আছে, এবং যশের আকাঙ্ক্ষা ও নিন্দার ভয় আছে, তখন যাহা সুখকর ও যশস্কর তাহাই আমাদের করিতে হইবে; কেন ঈশ্বর আমা-

দিগকে যশোনিন্দাদির ভাগী করিয়াছেন, এ অজ্ঞাতব্য বিষয়ের অনুসন্ধান করিবার অধিকার আমাদের নাই।

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য এই যে কোন কার্য্য কাহার উপযোগী তাহা আমরা বুঝিব কি প্রকারে? আমাদের বোধ হয় তাহা বুঝিবার অতি সহজ উপায় আছে, অর্থাৎ ঈশ্বর যাহাকে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন, তদনুরূপ কার্য্যই তাহার উপযোগী বলিতে হইবে—শক্তি দেখিয়া উপযোগী কার্য্য নির্ণয় করিতে হইবে। ঈশ্বর সিংহকে মাংসলোলুপ করিয়াছেন, সুতরাং প্রাণিবধ সিংহের উপযোগী কার্য্য। চুম্বকের লৌহাকর্ষণ শক্তি দিয়াছেন, সুতরাং চুম্বকের লৌহাকর্ষণ উপযোগী কার্য্য। ঐরূপ মানবে যে শক্তি প্রদত্ত হইয়াছে, তদনুরূপ কার্য্য মানবের উপযোগী। সেইরূপ কার্য্য করিলেই মানব রক্ষিত হইবে এবং যশস্বী সুখী ও পুণ্যবান বলিয়া অভিহিত হইবে। অথবা ঈশ্বর যাহাকে যে শক্তি দিয়াছেন সেই শক্তি প্রকাশকরাই তাহার কার্য্য। সুতরাং মানব যে সকল শক্তি প্রাপ্ত হইয়াছে তৎ সমস্ত প্রকাশ করাই তাহার উপযোগী কার্য্য। কিন্তু দেখা যাইতেছে মানবে বহুশক্তি সন্নিবিষ্ট হইয়াছে এবং সেই সকল শক্তি আবার পরস্পর বিরুদ্ধস্বভাবাপন্ন। ভয় সাহস, দয়া নিষ্ঠুরতা, স্বার্থপরতা পরার্থপরতা, শ্রদ্ধা ঘৃণা, আশক্তি বিরক্তি, লোভ তৃপ্তি, ক্রোধ ক্ষমা, জিজীবিষা মুমূর্ষা প্রভৃতি সমস্ত শক্তিই পরস্পর বিপরীত ভাবসম্পন্ন। বোধ হয় মানবশরীরে এমন মনোবৃত্তিই নাই যে তাহার বিপরীত আর একটী নাই। সুতরাং এক শক্তির অনুরূপ কার্য্য করিতে হইলে তাহার বিরোধী শক্তির কার্য্যের বাধা দেওয়া হয়। ভয় করিলে সাহসের কার্য্য করা হয় না, আশক্ত হইলে বিরক্তির কার্য্য করা হয় না। কোন এক বৃত্তির অনুরূপ কার্য্য করিলেই আর একটী বিরুদ্ধ ভাবাপন্ন বৃত্তির বিরোধাচরণ করা হয়। তবে কি প্রকারে মানব ঈশ্বরদত্ত শক্তি সকলের অনুরূপ কার্য্য করিবে? ঈশ্বরের অভিপ্রেত উপযোগী কার্য্য সম্পন্ন করিতে হইলে, যখন প্রদত্ত সকল প্রকার শক্তিরই অনুরূপ কার্য্য করিতে হইবে, ও যখন একটী বৃত্তির চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে গেলে আর একটী বৃত্তির কার্য্যের বাধা ঘটে তখন কিরূপে মানব কর্ত্তব্য সম্পন্ন করিবে? ইহার উপায় বিধান জন্য পরমেশ্বর আমাদিগের হৃদয়ে এক বিচারক শক্তি প্রদান করিয়াছেন; সেই বিচারকের পরামর্শ অনুসারে আমাদের বৃত্তি সকলের

পরিচালনা করিলে, সকল শক্তিরই পরিচালনা হয়। কোন্ সময়ে কোন্ বৃত্তির কিরূপ পরিচালনা আবশ্যক তাহা সেই বিচারক বৃত্তি বিবেক আমাদিগকে বলিয়া দিবেন। বিবেকের মতানুযায়ী কার্য্য করাই আমাদের কর্ত্তব্য ও ঈশ্বরের অভিপ্রেত রক্ষার একমাত্র উপযোগী এবং উহাই ধর্ম্ম নামে অভিহিত। ধৃ ধাতু হইতে ধর্ম্ম শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে। ধৃ ধাতুর অর্থ ধারণ বা রক্ষা করা—যে রূপ আচরণ আমাদের রক্ষা বিধানে সমর্থ তাহাই ধর্ম্ম শব্দবাচ্য। পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মানবের রক্ষাবিধান জন্য যে সকল কার্য্য আবশ্যক, পরমেশ্বর আমাদের হৃদয়ে সেই সকল কার্য্য সাধনের উপযোগী ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তি প্রদান করিয়াছেন, এবং সেই সকল বৃত্তির যথাপরিচালন জন্য বিবেক দিয়াছেন সেই বিবেকের নির্দ্দেশানুসারে মনোবৃত্তি সকলের চালনা করিলেই যে সময়ে যে বৃত্তির যে পরিমাণ পরিচালন প্রকৃত মঙ্গলকর তাহা সম্পন্ন হইয়া মানব রক্ষিত হয়। অতএব বিবেকানুমোদিত কার্য্যই মানবের ধর্ম্ম এবং ধর্ম্মই মানবের একমাত্র পরম বন্ধু। "ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকম্।"

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

ধর্ম্মশাস্ত্র।

এক্ষণে এই আপত্তি উত্থাপিত হইতে পারে যে, যখন সপ্রমাণ হইল ঈশ্বর কর্ত্তব্য নিরূপণের উপায়বিধানজন্য সকল মনুষ্যের হৃদয়েই বিবেক শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তবে সকলে কর্ত্তব্যপরায়ণ হয় না কেন? আর যদি বিবেক নামক শক্তিবিশেষই মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার একমাত্র কারণ হয়, তাহা হইলে ইতর প্রাণিগণ যেমন ঈশ্বরদত্ত স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করে, মানবগণ সেইরূপ ঈশ্বরদত্ত বিবেকের প্রবর্ত্তনা অনুসারে নির্দ্দিষ্ট একবিধ কার্য্য করে না কেন? অর্থাৎ সকল সিংহ যেমন প্রাণী বধ করে, সকল ছাগই যেমন উদ্ভিজ্জ ভক্ষণ করে, সকল ময়ূরই যেমন সুন্দর পুচ্ছ বিস্তার করে, সকল কোকিলই যেমন সুস্বরে গান করে, সেইরূপ সকল মনুষ্য একরূপ কার্য্য করে না কেন? কেন কেহ মাংসাশী, কেহ নিরামিষভোজী, কেহ সংসারী কেহ বিরাগী, কেহ সাহসী, কেহ ভীত, কেহ দয়াবান, কেহ নিষ্ঠুর হয়? ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির হৃদয়ে কি ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বিবেক আছে? না কাহারও হৃদয়ে বলবান বিবেক ও কাহারও হৃদয়ে দুর্ব্বল বিবেক আছে? যদি তাহা হয় তবে এরূপ ভিন্নতার কারণ কি? এইরূপ সংশয় করিয়া অনেকে বিবেকের সত্তা স্বীকার করেন না।

আমাদের বোধ হয় এরূপ সংশয়ের কোন কারণ নাই। কেন না বিবেক পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতানুযায়ী হিতাহিতজ্ঞান (conscience) বা তদনুরূপ বৃত্তি বিশেষ নহে। শূন্য যেমন একাকী কোন প্রকার শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না, শূন্যের শক্তি প্রকাশ করিতে হইলে যেমন কোন অঙ্কের সহায়তা আবশ্যক, বিবেকও সেইরূপ একাকী কোন শক্তি প্রকাশ করিতে পারে না, বিবেকের শক্তি প্রকাশ করিতে জ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক। জ্ঞান না হইলে বিবেক আদৌ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত হয় না যেমন

স্ফটিকের কোন বর্ণ উপলব্ধ হয় না, যে স্ফাটিকপাত্রে যে বর্ণের জল রাখা যায়, সেই স্ফাটিকপাত্র তদ্রূপ বর্ণ বিশিষ্ট হয়, সেইরূপ যে মানব যেমন জ্ঞান লাভ করে তাহার বিবেক সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। মনের অন্যান্য বৃত্তি সকল যেমন বিষয়প্রাপ্তি মাত্রেই স্ব শক্তি প্রকাশ করে, বিবেক সেরূপে স্বশক্তি প্রকাশ করিতে পারে না। যখন কোন বিষয় লইয়া একাধিক বৃত্তির বিবাদ উপস্থিত হয়, সেই সময়ে বিবেক জ্ঞানানুযায়ী মীমাংসা করে মাত্র। যে মানব যেমন জ্ঞান লাভ করে, তাহার বিবেক সেই-রূপ মীমাংসা করে; বিবদমান বিষয়ে যে মানবের কোন জ্ঞান লাভ হয় নাই তাহার বিবেক মীমাংসা পথে অগ্রসরই হয় না। দরিদ্র দেখিয়া দয়া অর্থ দান করিতে প্রবৃত্তি দিল, পরক্ষণেই সঞ্চয়েচ্ছা অর্থনাশভয়ে দান করিতে নিষেধ করিল; মনোবৃত্তি দ্বয়ের এইরূপ অসামঞ্জস্যসময়ে দান করা উচিত কি না, যে মানব পূর্ব্বে এ বিষয়ে কোন জ্ঞান অর্জ্জন করিয়া থাকে, তাহার বিবেক সেই জ্ঞানের অনুরূপ মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয়; সেরূপ কোন জ্ঞান যে মানবের জন্মে নাই তাহার বিবেক কোন মীমাংসায় প্রবৃত্ত হয় না, তাহার যে মনোবৃত্তি প্রবল থাকে সে তাহারই অনুরূপ কার্য্য করে। যাহার যেরূপ জ্ঞান লাভ হইয়াছে তাহার বিবেক সেই রূপ মীমাংসা করে। কাহারও বিবেক মীমাংসা করে সমস্ত অর্থ দান করা উচিত নহে, আপনার ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের উপযোগী অর্থ রাখিয়া অবশিষ্ট দান করা উচিত; কাহারও বিবেক মীমাংসা করে আপদ্ কালের জন্য ধনসঞ্চয় আবশ্যক, অতএব কিছুমাত্রও দান করা উচিত নহে; কাহারও বিবেক বলে দানের যোগ্য পাত্রকে দান করা উচিত; কাহারও বিবেক বলে দানপত্রের যোগ্যাযোগ্যের বিচার অনাবশ্যক, ধন ক্ষণ-স্থায়ী, অতএব যে যাহা যাচ্ঞা করিবে তাহাকে তাহাই দিয়া সুখী করা কর্ত্তব্য; কাহারও বিবেক বলে, অদ্যকার শাকান্ন মাত্রের সংস্থানই আপনার ও পরিবারবর্গের ভরণ পোষণের উপযোগী; তাহাই মাত্র রাখিয়া অবশিষ্ট দান করা যাইতে পারে; কাহারও বিবেক বলে, আপনার ও পরিবারের ভরণপোষণ জন্য অন্ততঃ এক মাসের উপযোগী বিবিধ প্রকার খাদ্য, বিচিত্র বেশ ভূষা ও প্রয়োজনীয় অন্যান্য বহুবিধ পদার্থ সঞ্চিত রাখা আবশ্যক সুতরাং সেই পরিমাণ অর্থ না রাখিয়া দান করা উচিত নহে; কাহারও

বিবেক বলে ব্রাহ্মণই দানের উপযুক্ত পাত্র ; কাহারও বিবেক বলে, দরিদ্রই দানের উপযুক্ত; কাহারও বিবেক বলে. কি ব্রাহ্মণ কি দরিদ্র কেহই দানের পাত্র নহে, দরিদ্রকে দান করিলে আলস্যের প্রশ্রয় দেওয়া হয় এবং ব্রাহ্মণকে দান করিলে নানাপ্রকার কুকার্য্য, আলস্য ও কুসংস্কারের বৃদ্ধি হয়। এই প্রকারে বিবেক একই বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার মীমাংসা করিয়া থাকে। জ্ঞানলাভের ভিন্নতাই বিবেকের এরূপ মতভেদের কারণ। যাহার যেরূপ জ্ঞান তাহার সেইরূপ বিচার শক্তি। ভ্রমাচ্ছন্ন জ্ঞানের বশীভূত হইয়া যেমন বিচারক রামের সম্পত্তি শ্যামকে দেন, বিবেকও সেইরূপ ভ্রমাচ্ছন্ন জ্ঞানের অধীন হইয়া অযথা মীমাংসা করে। প্রকৃত জ্ঞান লাভ হইলে বিবেক সুবিচারকের ন্যায় অভ্রান্ত বিচার করিতে সমর্থ হয়। সুতরাং সত্য জ্ঞান সম্পন্ন বিবেকের অধীন হইয়া কার্য্য করিতে পারিলেই মানব প্রকৃত কর্ত্তব্য সম্পাদনে সমর্থ হয়; অন্যথা হইলে কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে না। এই জন্য জ্ঞান ধর্ম্মসাধনের প্রধান সহায়।

কিন্তু জ্ঞান বিষয়সাপেক্ষ অর্থাৎ বিষয়ের সহিত আমাদের শারীর ও মানসিক বৃত্তিসকলের সংযোগে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাকেই জ্ঞান বলে। রৌদ্র স্পর্শে ত্বকের যে ভাব উপস্থিত হয়, তাহাকে তাপজ্ঞান বলে ; শর্করা স্পর্শে জিহ্বার যে ভাব জন্মে তাহকে মিষ্ট জ্ঞান, পদ্মপুষ্পের গন্ধ স্পর্শে নাসিকার যে ভাব জন্মে তাহাকে সুগন্ধ জ্ঞান, অন্ন স্পর্শে উদরের যে ভাব জন্মে তাহাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি জ্ঞান বলে। এইরূপ বিষয় বিশেষের সহিত ইন্দ্রিয় বা মনোবৃত্তিবিশেষের মিলনে যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহাই জ্ঞানপদ বাচ্য। সেই সকল জ্ঞানে বা ভাবান্তরে সুখ দুঃখরূপ শারীরিক বা মানসিক যে ভাবান্তর উপস্থিত হয়, তাহার উপলব্ধি করিয়া বিবেক কোন্ বিষয় আমাদের উপযোগী ও কোন্ বিষয় আমাদের অনুপযোগী তাহা স্থির করে। যে জ্ঞান-লাভ করিয়া বিবেক উপযোগী বিষয় নির্ব্বাচন করিতে পারে না সে জ্ঞান হিতকর হয় না, সুতরাং তাহা প্রকৃত জ্ঞান নহে। মনে কর আমি কখনও আম্র দেখিনাই, উহার গুণও জানি না, এরূপ অবস্থায় একটী আম্র দেখিয়া, তাহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইলাম ; কিন্তু পরক্ষণেই ভয় উপস্থিত হইয়া, উহা আমাদের হিতকর কি না এই সংশয় জন্মাইয়া দিল। তখন বিবেক ইন্দ্রিয় সকলের সাহায্যে উহার গুণ পরীক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইল। পরে যখন

জিহ্বা দ্বারা জানা গেল উহা অতি সুরস, তখন তাহা গলাধঃকৃত করিলাম, সেই আম্র ভক্ষণ করিয়া ক্ষুধার নিবৃত্তি হইল, কোন প্রকার অসুখ হইল না। তখন বিবেক স্থির করিল আম্র আমাদের উপযোগী খাদ্য। তদনুসারে আর এক দিন আম্র ভক্ষণ করিলাম। সে দিন রসনা তৃপ্ত ও উদর পূর্ণ হইল বটে, কিন্তু শরীর অসুস্থ হইল। এরূপ অবস্থায় সে দিনকার আম্রভক্ষণব্যাপারে ও অদ্যকার আম্রভক্ষণব্যাপারে যে ভিন্নতা আছে তাহা যদি জানিতে পারা যায়, তবে বিবেক সেই জ্ঞানানুসারে আম্রভক্ষণ সম্বন্ধে অধিকতর জ্ঞাতব্য আবিষ্কার করিতে পারিবে, যদি তাহা জানিতে না পারে, তবে হয় বিবেক কোন প্রকার মীমাংসা করিতে অগ্রসর হইবেনা, স্বাভাবিক ভয় উপস্থিত হইয়া আম্র ভক্ষণ নিষেধ করিবে, অর্থাৎ বিবেকের স্ফূর্ত্তি না হওয়ায় স্বাভাবিক ভয়ের অধীন হইয়াই মানব কার্য্য করিবে, অথবা ভ্রমপূর্ণ অনুমানের সহায়তায় অপ্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া অযথা মীমাংসা করিবে। যদি জানা যায় যে পূর্ব্বভক্ষিত আম্রটী মিষ্ট ও অদ্য ভক্ষিত আম্রটী অম্ল, তবে বিবেক স্থির করিবে অম্লরসাত্মক আম্র খাদ্য নহে; যদি জানা যায় আম্রটী টক নয় কিন্তু পূর্ব্ব দিন অপেক্ষা অধিক পরিমাণে খাওয়া হইয়াছে, তবে স্থির হইবে অধিক আম্র খাওয়া উচিত নহে। যদি উভয় দিনই সমান মিষ্ট আম্র সমান পরিমাণ খাওয়া হইয়া থাকে, কিন্তু যদি বুঝা যায় যে সে দিন যেরূপ ক্ষুধা ছিল, অদ্য সেরূপ ছিল না, তবে সিদ্ধান্ত হইবে, ক্ষুধা না থাকিলে আম্র খাওয়া উচিত নয়। যদি ক্ষুধাও সমপরিমাণে ছিল জানা যায়, কিন্তু যদি বুঝা যায় যে অদ্য সর্দ্দি বা শরীরের ভাবান্তরাবস্থায় আম্র খাওয়া হইয়াছে, তবে এই সিদ্ধান্ত হইবে যে সর্দ্দি প্রভৃতি পীড়ার সময়ে আম্র খাওয়া উচিত নয়। এই প্রকারে পূর্ব্বে যে দিন যে সময়ে যেরূপ অবস্থায় যেরূপ আম্র যে পরিমাণ খাইয়া ছিলাম, অদ্য তাহার যে বিষয়ে কিছু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায় সেই ব্যতিক্রমই আম্রভক্ষণে অসুস্থতার কারণ, এইরূপ মীমাংসা উপস্থিত হয়। কোন ব্যতিক্রম বুঝিতে না পারিলে, অনেক সময় অনুমানের উপর সিদ্ধান্ত চালিত হয়। কেহ অনুমান করেন অদ্যকার আম্রের প্রকৃতিগত কোন দোষ আছে; কেহ অনুমান করেন আম্র নানা জাতীয়, অদ্য যে জাতীয় আম্র খাইয়াছি তাহা আমাদের খাদ্য নয়। কেহ অনুমান করেন এই আম্রটী কোন

ঠাকুরের জন্য কেহ রাখিয়াছিল, ঠাকুরের জন্য রক্ষিত আম্র খাওয়া উচিত নহে। এই প্রকারে নানাপ্রকার অনুমান ও কল্পনা উপস্থিত হইয়া প্রকৃত জ্ঞান লাভে বাধা প্রদান করে, বিবেকও সেই জ্ঞানের অধীন হইয়া ভ্রমাত্মক মীমাংসা করে। তাই একই বিষয় সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির ভিন্ন ভিন্ন মত। যদি অনুসন্ধানের পথ সমস্ত পরিজ্ঞাত থাকে, তাহা হইলে ওরূপ অনুমান অবলম্বন না করিয়া, প্রকৃত তত্ত্ব অবগত হওয়া যায়। কিন্তু সমধিক জ্ঞান না থাকিলে অনুসন্ধানের সমস্ত পথ অবগত হওয়া যায় না। শরীরতত্ত্ব ও আম্রতত্ত্ব যদি ভাল জানা থাকে অর্থাৎ পূর্ব্ব দিন শরীরের কিরূপ অবস্থা ছিল, অদ্যই বা কিরূপ আছে এবং পূর্ব্ব দিন যে আম্র ভক্ষণ করা হইয়াছিল সে আম্রের প্রকৃতি কিরূপ এবং অদ্যকার আম্রের প্রকৃতিই বা কিরূপ ইত্যাদি জ্ঞাতব্য বিষয় সকল যদি জানিতে পারা যায়, তাহা হইলে সে দিন কেন আম্র খাইয়া অসুস্থ হই নাই, অদ্যই বা কি জন্য অসুস্থ হইলাম, তাহা বুঝিতে পারিয়া আম্র ভক্ষণ সম্বন্ধে কর্ত্তব্য স্থির করা যায়। সকল জ্ঞান সম্বন্ধেই ঐরূপ অর্থাৎ যত জ্ঞানালোচনা করিয়া বিবেকের অনুসন্ধানের পথ পরিষ্কৃত করিতে পারা যায়, ততই বিবেক তত্ত্বজ্ঞ হইতে থাকে। এইরূপ বিবেকই প্রকৃত জ্ঞানলাভের সহায়। বিবেকানুমোদিত জ্ঞানই প্রকৃত জ্ঞান এবং জ্ঞানোন্নত বিবেকই প্রকৃত জ্ঞানের সহায়। ভ্রমাচ্ছন্ন জ্ঞানপূর্ণ হৃদয়ের বিবেক দূষিত হইয়া যায়। জ্ঞান দ্বারা বিবেকের স্ফূর্ত্তি হয় বলিয়াই জ্ঞানের এত মহিমা। স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত বিবেকের অনুমত জ্ঞান বিজ্ঞান পদবাচ্য। তাই বিজ্ঞান মানবের প্রধান অবলম্বনীয় এবং বিজ্ঞানবিহিত কার্য্য ধর্ম্ম পদ বাচ্য। তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞান একই কথা। বিজ্ঞান-পরায়ণ বা তত্ত্বজ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তিগণ জ্ঞানী বলিয়া অভিহিত হয়েন। অতএব বিবেককে প্রকৃত জ্ঞান সম্পন্ন করা আমাদের নিতান্ত আবশ্যক।

কেবল জ্ঞানোন্নতি হইলেই বিবেকের যথোচিত স্ফূর্ত্তি বিধান হয় না, বিবেককে প্রকৃত স্ফূর্ত্তিমান করিতে হইলে, তাহার শক্তি বৃদ্ধি করিতে হইবে। কেন না মনোবৃত্তি সকল স্বতঃ বিবেকের মতানুসারে চলে না। তাহারা অনেক সময়েই বলাধিক্য প্রযুক্ত বিবেকবিধির অন্যথা করিয়া স্বীয় কার্য্য সম্পাদন করে। তাই অনেক জ্ঞানী ব্যক্তিও কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে সক্ষম হয়েন না। মনে কর বিবেক বুঝাইয়া দিল আম্র খাওয়া উচিত নয়, কিন্তু লোভ প্রবল

হইয়া বিবেকের উপদেশ শুনিতে দিল না, মানব লোভের অধীন হইয়া আম্র ভক্ষণ করিয়া পীড়িত হইল। অতএব যেমন বিবেককে জ্ঞানসম্পন্ন করিতে হইবে, সেইরূপ সকল বৃত্তি অপেক্ষা বিবেককে অধিক তেজস্বী করিতে হইবে। বিবেককে এমন তেজস্বী করিতে হইবে যে, কোন বৃত্তিই যেন বিবেকের প্রভুতা অস্বীকার করিতে না পারে। এ কার্য্য কেবল জ্ঞান-লাভ দ্বারা সম্পন্ন হয় না, ইহা সম্পূর্ণ অনুশীলনসাপেক্ষ। অতএব জ্ঞান লাভের সঙ্গে সঙ্গে অনুরূপ অনুশীলন করা নিতান্ত আবশ্যক। যাহারবিবেক জ্ঞান দ্বারা স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত ও অনুশীলন দ্বারা তেজস্বী হইয়াছে, সেই ব্যক্তিই প্রকৃত বিবেকবান্ নামে অভিহিত হইতে পারে। সেই ব্যক্তির অনুষ্ঠিত কার্য্যই প্রকৃত কর্ত্তব্য ও ধর্ম্মপদ বাচ্য। তিনি অন্যেরও শিক্ষকস্থানীয়। জ্ঞান ও অনুশীলন উভয়ই আমাদের একান্ত প্রয়োজনীয়। জ্ঞান লাভ হইলে বিবেক স্ফূর্ত্তিমান্ ও সুবিচারক্ষম হয় এবং অনুশীলন দ্বারা শারীরিক ও মানসিক বৃত্তি গুলি বিবেকের নিয়োগাধীনে কর্ত্তব্য সম্পন্ন করে। এইজন্য ঋষিগণ জ্ঞান ও অনুশীলনপদ্ধতি উভয়কেই ধর্ম্ম সাধনের উপযোগী বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন। উহাদের একের অভাব হইলে কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয় না। কেন না জ্ঞান না জন্মিলে কর্ত্তব্য বুঝিতে পারাযায় না, এবং অনুশীলন দ্বারা শক্তি সম্পন্ন না হইলে কর্ত্তব্য বুঝিলেও তদনুযায়ী কার্য্য করিতে সমর্থ হওয়া যায়না।

এক্ষণে বিবেচ্য এই যে মনুষ্য উক্তরূপে স্বকীয় চেষ্টা দ্বারা জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুযায়ী অনুশীলন করিতে সমর্থ কি না? আমাদের বোধ হয় কোন মানবেরই সেরূপ শক্তি নাই। কেন না জ্ঞানের বিষয় অনন্ত। শারীরবিদ্যা, প্রাণিবিদ্যা, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা, ভৌতিকবিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, রসায়ন, জ্যোতিষ, ভূবিদ্যা প্রভৃতি অসংখ্য পদার্থ বিদ্যা, এবং মনোবিদ্যা, নীতি বিদ্যা, সমাজবিদ্যা, আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব প্রভৃতি অসংখ্য বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা মানবের আবশ্যক। যে বিষয়ের জ্ঞান লাভ না হইবে, বিবেক তদ্বিষয়ের কোন কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে পারিবে না; সুতরাং মানব তদ্বি-ষয়ক কর্ত্তব্য কার্য্যের অনুষ্ঠানে আদৌ সমর্থ হইবে না। কিন্তু কোনও একটী বিষয়ের জ্ঞান লাভ করিতেই কত কাল অতিবাহিত হইয়া যায়। পূর্ব্বে প্রতিপন্ন হইয়াছে কোন্ অবস্থায় কি প্রকৃতির আম্র কি পরিমাণ আমাদের

খাদ্য, তাহাই স্থির করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা-যাইতেছে যে, কিছুতেই মানব স্বচেষ্টা মাত্রে প্রকৃত জ্ঞানলাভ করিতে পারে না। সকল বিষয়েরজ্ঞান লাভ করা দূরে থাকুক, এক বিষয় মাত্রের জ্ঞান লাভ করাও মানবের স্বচেষ্টামাত্র সাধ্য নহে। যদিও স্বীকার করা যায় যে মানব অশেষ চেষ্টা করিয়া কোন বিষয়ের জ্ঞান লাভে সমর্থ হয়, তাহা হইলেও তাহার অনুশীলন কার্য্য তাহার দ্বারা হয় না; কেন না দশ বৎসর বয়ঃ-ক্রমের পূর্ব্বে মানবের বিবেক স্ফূর্ত্তি পায় না; অথচ স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত বিবে-কের সহায়তা ব্যতিরেকে সত্য জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুতরাং পঞ্চদশ বৎসরের পর হইতে মানব জ্ঞানার্জন করিতে আরম্ভ করে এবং হয় ত প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিতে বৃদ্ধ কাল উপস্থিত হয়। তবে কবে সে জ্ঞানের অনুশীলন করিবে? বাল্যকাল হইতে আরম্ভ না করিলে যে অনুশীলন হইতেই পারে না। অভ্যাস বা সংস্কার পাকিয়া গেলে তাহাকে নমিত করিতে পারা যায় না। বাল্যসংস্কার বড় দৃঢ় সংস্কার। বাল্যকালে শিক্ষা না করিলে শিক্ষা হয় না, বাল্যকালে শরীর সুস্থ না রাখিলে জীবন থাকে না, বাল্যকালে চরিত্র গঠিত না হইলে সৎস্বভাব হয় না। যাহা যাহা আবশ্যক সমস্তই বাল্যকালে আরম্ভ করিতে হইবে। সেই বাল্যকালে যখন মানব একান্ত অজ্ঞান, তখন মানব কি প্রকারে কিসের অনুশীলন করিবে?

এই সকল বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝা যায় কখনই কেহ কেবল স্বচেষ্টা বলে বিবেককে জ্ঞানোন্নত করিতে ও তাহাকে অন্য সকল মনোবৃত্তির উপরে আধিপত্য করিবার উপযোগী করিতে পারে না। সেই জন্য কেহ স্বচেষ্টা মাত্রে জ্ঞানলাভের চেষ্টা করে না, পূর্ব্বপণ্ডিতগণ যে সকল বিষয়ের তত্ত্ব নিরূপণ করিয়া গিয়াছেন, তাহা শিক্ষা করিয়াই সকলে জ্ঞান-লাভ করে, ও তাঁহাদের উপদেশানুসারে অনুশীলন পরায়ণ হয়। বাস্তবিক শিক্ষাই আমাদের বিবেকবান্ হইবার একমাত্র উপায়। কিন্তু ইহার কয়েকটী প্রবল বাধা আছে। প্রথমতঃ পণ্ডিতগণের নির্ণীত সকল জ্ঞান সত্য নহে, দ্বিতীয়তঃ মানব মানবান্তরের সম্পূর্ণ নিদেশবর্ত্তী হইতে চায় না, তৃতীয়তঃ মানব সকলকে হিতকারী বলিয়া বিশ্বাস করে না, চতুর্থতঃ কোন ব্যক্তিই আপনার বুদ্ধির নিন্দা করে না, সকলেই বিবেচনা করে যে, সে

যাহা বুঝিয়াছে তাহাই সত্য ও হিতকর, পরের মীমাংসা নিতান্ত ভ্রান্তি-সঙ্কুল, স্বার্থপরতাজন্যপ্রতারণাদূষিত ও অনিষ্টকর। এইজন্য আপনার বিবেচনার প্রতিকূল পরকীয় উপদেশকে হিতকর বলিতে মানবের অনেক সময়েই প্রবৃত্তি হয় না। বিশেষতঃ যখন প্রবল বৃত্তিবিশেষ হৃদয়ে আধিপত্য করিতে থাকে, তখন সেই বৃত্তির অধীন হইয়া মানব এমন অন্ধ হয় যে, যিনি সেই বৃত্তি নিরোধক উপদেশ প্রদান করেন তদীয় বুদ্ধি বিবেচনা ও সাধুতার উপর মানবের প্রবল সন্দেহ উপস্থিত হয়। সেই জন্য পুত্রও ভ্রান্তি-সঙ্কুল বিবেচনায় অতি জ্ঞানবান্ ও একান্ত শুভাকাঙ্ক্ষী পিতার উপদেশ বাক্যানুসারে চলিতে চায় না; যে নিঃস্বার্থ প্রাচীনভারতীয় ব্রাহ্মণগণ আপনাদের সমস্ত প্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া কেবল পরের হিতসাধনে ব্যস্ত থাকিতেন, যাঁহারা রাজপদলাভের উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হইয়াও যৎকিঞ্চিৎ ভিক্ষামাত্রলব্ধ শাকান্নমাত্রে তুষ্ট থাকিয়া নিয়ত জ্ঞানবিস্তার ও পরহিত সাধনে নিরত থাকিতেন, সেই নরদেবগণের জ্ঞানগর্ভ উপদেশও ভ্রমপূর্ণ ও স্বার্থদূষিত বলিয়া অনেকে অনাদর করেন। সত্য বটে কোন কোন পণ্ডিতের প্রতি কাহারও কাহারও প্রবল শ্রদ্ধা দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু সেরূপ শ্রদ্ধা অতি অল্প লোকেরই হইয়া থাকে এবং তাহাও অধিক বয়সে ভিন্ন হইতে পারে না, সুতরাং তদনুসারে অনুশীলন হওয়া সম্ভব নহে। বিশেষতঃ প্রভূত শিক্ষালাভ ব্যতীত পূর্ব্বপণ্ডিতগণের নির্ণীত জ্ঞান-রাশির মধ্য হইতে সত্যজ্ঞান নির্ব্বাচন করিতে পারা যায় না। কিন্তু কয় জন সেরূপ শিক্ষা লাভ করিতে পারে? বোধ হয় সহস্রের মধ্যে একজনও সেরূপ শিক্ষালাভে সমর্থ হয় না। প্রত্যুত অনেকে কুশিক্ষা প্রবুদ্ধ বিবেকের প্ররোচনায় ভ্রমাচ্ছন্ন জ্ঞানকেই সত্য মনে করিয়া লয়। আধুনিক নব্যযুবক-দলই তাহার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। অতএব বিদ্যাশিক্ষা করিলেই মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে না।

কেহ কেহ বলেন শাসনপ্রণালী অবলম্বনে মানবকে পণ্ডিতগণের নির্দ্দিষ্ট সুপথাবলম্বী করিলে, মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে; অর্থাৎ যদি রাজা পণ্ডিতগণের সহায়তায় মানবের কর্ত্তব্য কার্য্য সকল নির্ণীত করিয়া দিয়া, যিনি সেই নির্ণীত বিধির (আইনের) পালন করিবেন, তিনি পুরস্কৃত ও যিনি তাহার অপালন করিবেন তিনি দণ্ডিত হইবেন, এইরূপ বিধান করেন

ও তদনুসারে শৈশবকালে পিতামাতা, বাল্যে শিক্ষক এবং যৌবন ও বৃদ্ধকালে রাজকর্ম্মচারিগণ দণ্ড ও পুরস্কার দান করেন, তাহা হইলে পুরস্কারের লোভে ও দণ্ডের ভয়ে মানব কর্ত্তব্যপরায়ণ হইতে পারে।

আমাদের বোধ হয় এ কথা নিতান্ত হাস্যাস্পদ। কেন না প্রথমতঃ দেখা যাইতেছে দণ্ড ও পুরস্কার বিধি দ্বারা মানবকে নিয়মিত করিতে হইলে ভয় ও লোভ এই দুইটী মাত্র রিপুর অযথা পরিচালন হয়—মনুষ্য এই দুই রিপুর পরতন্ত্র হইয়াই সকল কার্য্য সম্পন্ন করে; সুতরাং অন্যান্য সকল বৃত্তিই নিস্তেজ হইয়া পড়ে। কিন্তু তাহা ত ঈশ্বরের উদ্দেশ্য নহে। সকল বৃত্তির সম্যক্ চালনাই তাঁহার অভিপ্রেত। বিশেষতঃ ভয় ও লোভ উভয়ই জীবসাধারণ বৃত্তি বলিয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি সমূহের অন্তর্গত। সুতরাং উহাদের অতিরিক্ত চালনা করিলে মানব পশুতুল্য হয়। দ্বিতীয়তঃ পূর্ব্বে সপ্রমাণ হইয়াছে যে, মানবের বাক্যে মানবের তাদৃশ শ্রদ্ধা জন্মে না, অতএব পণ্ডিত-গণের ঐরূপ বিধি বাক্যে কি পিতামাতা, কি শিক্ষক, কি রাজা, কি সমাজ কাহারই দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে না। কিন্তু যে জ্ঞানের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস না থাকে, স্বয়ং তাহার অনুশীলন করিতে বা অন্যকে তাহার অনুশীলনে সযত্ন করিতে কাহারই তাদৃশ প্রবৃত্তি হয় না। সুতরাং পিতামাতা পুত্রকন্যাকে এবং গুরু শিষ্যকে সেরূপ দৃঢ়তার সহিত ঐ সকল বিধিবিহিত জ্ঞানোপদেশ প্রদান বা তৎসমস্তের অনুশীলনে যত্নপর করিতে যত্নবান হয়েন না; কাযেই তদ্দ্বারা প্রকৃত ফল লাভ হয় না। তৃতীয়তঃ সকল মনুষ্য উত্তমরূপ শিক্ষিত, অনুশীলিত বা সুবিচারপটু নহে। সুতরাং অযোগ্য বিচারকের অন্যায় শাসনের অত্যাচারে অনেক ব্যক্তিকে একান্ত আকুল হইতে হয়। প্রতিদিনই ইহার শত শত উদাহরণ পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। রাজশাসনবিষয়ে কিঞ্চিৎ সমালোচনা করিলেই এ বিষয় সহজে প্রতিপন্ন হইবে।

রাজশাসন সম্বন্ধে কিছু বলিতে হইলে, আমাদিগকে ইংরাজ রাজ-নিয়ম অবলম্বন করিয়াই বলিতে হইবে। কেন না তাহা হইলে সকলে ভালরূপ বুঝিতে পারিবেন এবং তাহাতে সাধারণের কোন আপত্তিরও সম্ভাবনা নাই। কারণ ইংরাজ জাতি আজি সভ্যতার উচ্চ সোপানে আরূঢ়, তাঁহাদের পদবীলাভে আজি সকলেই লালায়িত; সুতরাং তাঁহাদের কৃত নিয়ম ভাল নয় এ কথা কেহই বলিতে সাহসী হইবেন না।

রাজকীয় বিধির প্রধান দোষ এই যে, কি দুষ্কর্ম্মনিবৃত্তির ব্যবস্থা কি সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক ব্যবস্থা কিছুই সুনিয়মে কার্য্যসাধক হয় না। অর্থবলে সমস্তই বিপর্য্যস্ত করিতে পারা যায়। আবার রাজনিয়মাবলীর মধ্যে এমন কতকগুলি বাধক নিয়ম আছে, যে কেবল তাহারই দোষে অনেক সময়ে সত্য সকল গোপিত ও মিথ্যার প্রাদুর্ভাব বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মিথ্যা পথ অবলম্বন না করিলে প্রায় কেহই ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আপনার ধনপ্রাণ রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। বিধি নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে অভিযোগ উপস্থিত না করিলে কেহ আপন ক্ষতির পূরণ পাইবেন না, এই বিধির সুযোগ পাইয়া যে অভিযোগ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইয়াছে, মিথ্যা প্রমাণের বলে লোকে তাহাও বিধিনির্দ্দিষ্ট সময়ের পরে উপস্থিত বলিয়া সপ্রমাণ করে। ভিন্ন ভিন্ন স্থানের ও ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর অভিযোগ নির্দ্দিষ্ট ভিন্ন ভিন্ন বিচারালয়ে উপস্থিত করিতে হইবে এবং সম্পত্তির মূল্যানুসারে বিচারকর দিতে হইবে এই বিধির সুযোগ পাইয়া দুষ্ট লোকেরা সকল অভিযোগই 'বিধিনির্দ্দিষ্ট বিচারালয়ে উপস্থিত হয় নাই ও উপযুক্ত বিচারকর দেওয়া হয় নাই' বলিয়া দূষণীয় করিবার চেষ্টা করে। বিচারপ্রণালীর এইরূপ অসংখ্য প্রণালীগত বাধক নিয়ম আছে। অনেক সময়ে সেই সকলের বাধা অতিক্রম করিতে না পারিয়াই প্রকৃত সত্ত্ববান ব্যক্তি সত্ত্বশূন্য এবং দোষী নির্দ্দোষী ও নির্দ্দোষী দোষীরূপে পরিগণিত হয়। সত্য বিচারপ্রাপ্সুগণও ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিবার জন্য মিথ্যাচরণ করিতে বাধ্য হয়েন। সচরাচর সকলেরই ঐরূপ মিথ্যা-ব্যবহার আবশ্যক হওয়ায় তজ্জন্য মানবের লোকাপবাদভয়ও থাকে না। বিশেষতঃ কে সত্য পথাবলম্বী ও কে মিথ্যা পথাবলম্বী তাহা সকলে বুঝিতে পারে না। কেন না কেহ অধমর্ণকে বিশ্বাস করিয়া উপকারার্থে ঋণ দান করিয়া পরে অধমর্ণ বিশ্বাসঘাতক হইলে মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করে, কেহ বা প্রমাণ দিতে পারিলেই ডিক্রি পাওয়া যায় জানিয়া টাকা না দিয়াও মিথ্যা সাক্ষী প্রস্তুত করে; ইহাদের মধ্যে কে সত্যপরায়ণ ও কে মিথ্যাপরায়ণ তাহা অতি অল্প লোকেই জানিতে পারে। এই সকল অনিষ্ট নিবারণ জন্য আলেখ্যাদির নিয়ম হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে অধিকতর মিথ্যাচরণ ও অধিকতর জুয়াচুরি করিবার সুযোগ হইয়াছে। আইন যত কঠিন হইতেছে প্রতারণা করিবার পথ তত বাড়িতেছে।

রাজবিধির আর এক মহৎ দোষ এই যে কেহই উহার অনুশীলন করিতে পারে না। কেন না রাজবিধির পরিমাণ এত অধিক ও সর্ব্বদা তৎ-সমস্তের এত পরিবর্ত্তন সংঘটিত হয় যে, কোন ব্যক্তিই তৎসমস্ত অবগত হইয়া তদনুরূপ কার্য্য প্রণালী অবলম্বন করিতে পারে না; এমন কি ব্যবহারজীবগণও তৎসমস্ত অবগত হইতে পারেন না। বিশেষতঃ কূটতার্কিক পণ্ডিতগণ বিধিবাক্যের এত প্রকার নূতন নূতন ব্যাখ্যা করেন যে, একই বিষয়ের শত শত ভিন্ন প্রকার মীমাংসা দেখিতে পাওয়া যায়। সে সকলের মধ্যে কোনটী বিধি বাক্যের প্রকৃত অর্থ তাহা বুঝা কাহারই সাধ্যায়ত্ত নহে। সুতরাং যদিও কোন কোন ব্যক্তি অশেষ পরিশ্রম করিয়া তৎসমস্ত শিক্ষা করেন, কিন্তু তাহারা ফললাভে কেহ কৃতকার্য্য হয়েন না। এই সকল কারণে বিচারকার্য্য-প্রণালী এরূপ জটিল হইয়াছে যে, তাহাকে সত্য রক্ষার উপায় না বলিয়া মিথ্যা সৃষ্টির একমাত্র হেতু বলাই সঙ্গত। যাঁহার অর্থ অধিক আছে, যাঁহার উত্তম কৌশলজ্ঞ কর্ম্মকারক আছে, যিনি বিচক্ষণ উকীল প্রাপ্ত হয়েন তিনি সহস্র কুকর্ম্ম করিয়া অব্যাহতি পান ও পরের যথেষ্ট ক্ষতি করিয়া লাভবান হয়েন কিন্তু যাঁহার ঐ সকল নাই তিনি বিনা দোষে দণ্ডিত ও সর্ব্বস্বান্ত হয়েন।

আবার বিচারকের প্রকৃতি, চরিত্র, সংস্কার ও বুদ্ধির উপর বিচারকার্য্যের মঙ্গলামঙ্গল অনেক নির্ভর করে। কোন বিচারকের সংস্কার আছে, ভূম্যধিকারী মাত্রই অত্যাচারী; তিনি সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক নিরীহ ভূম্যধিকারীর সর্ব্বনাশ সাধন করেন। কোন বিচারকের সংস্কার আধুনিক প্রজাগণ অত্যন্ত দুষ্ট; তিনি সেই সংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়া অনেক সাধু প্রজার সর্ব্বস্বান্ত করেন। কোন বিচারক স্বজাতি বা আত্মীয়ের অনুরোধে নির্দ্দোষীর প্রতি অত্যাচার করেন ও কোনও বিচারক বুঝিতে না পারিয়া বা অকারণ রাগান্ধ হইয়া অন্যায় বিচার করেন।

ব্যবহারজীবদিগের ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিও সুবিচারের সামান্য প্রতিবন্ধক নহে। ব্যবহারজীবগণ নিযোক্তার স্বার্থ সাধন জন্য নিয়তই সত্যকে মিথ্যা ও মিথ্যাকে সত্য করিবার চেষ্টা করেন। যে পক্ষে তাঁহারা বৃত হয়েন সে পক্ষের জয়কামনাই তাঁহাদের প্রধান উদ্দেশ্য; তাহা সহস্র মিথ্যা দোষে দুষ্ট হউক, মানবজাতির সমূহ অমঙ্গলের কারণ হউক, কিছুই তাঁহারা

দেখেন না—যে পক্ষে বৃত হইয়াছেন, সে পক্ষের জয়লাভ ও আপনার পসার বৃদ্ধি হইলেই তাঁহাদের সকল উদ্দেশ্য সাধিত হইল। অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, 'যথাসময়ে ও উপযুক্ত বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত হয় নাই, সম্পত্তির ন্যায্য মূল্য ধরা হয় নাই, অভিযোগের প্রকৃত কারণ নাই, সকল অর্থীর ও সকল প্রত্যর্থীর নামের উল্লেখ হয় নাই, যথাসময়ে ফী দেওয়া হয় নাই, সাক্ষীর উপস্থিতি জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা হইয়াছে তাহা যথেষ্ট নহে, সাক্ষী অযথা সময়ে উপস্থিত হইয়াছে' ইত্যাদি বাজে কথায় ব্যবহারজীবগণ আসল বিচার্য্য বিষয় এককালে ঢাকিয়া দেন। ঐ সকল বাজে কথা সপ্রমাণ বা অপ্রমাণ করিতে এত অর্থ ও কাল ব্যয়িত হয় যে, অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়েই ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়ে। সেই সকল বাজে কথার দোষেই অনেক অভিযোগ নষ্ট হইয়া যায়, প্রকৃত সত্যের অনুসন্ধানই হয় না। এই প্রকারে ব্যবহারজীবদিগের অতিবিদ্যাবুদ্ধি প্রভাবে অনেক দোষী নির্দ্দোষী হয় ও অনেক অনধিকারী অধিকার প্রাপ্ত হয় এবং ব্যবহারজীবগণের অনুপযুক্ততা হেতু অনেক নির্দ্দোষী দোষী ও অনেক স্বত্ববান স্বত্বশূন্য হয়।

বিচারপ্রণালীর আর একটি মহৎ দোষ এই যে, উচ্চতন কর্ম্মচারিগণ নিয়ত অধীন কর্ম্মচারীদিগকে তাড়না করেন। 'কেন এত অল্প মকদ্দমার বিচার হয়, কেন নিষ্পত্তি আপীলে বিপরীত হয়, কেন এত অল্প আসামী দণ্ড পায়, কেন অপরাধকারিগণ ধৃত হয় না, ইত্যাদি বিষয়ে উচ্চতন কর্ম্মচারিগণ সর্ব্বদা নিম্নতন কর্ম্মচারীদিগকে ধমক দিয়া থাকেন। তৎসমস্তের উপযুক্ত উত্তর দিতে না পারিলে অকর্ম্মণ্য নামে অভিহিত হইতে হইবে এই ভয়ে নিম্নতন কর্ম্মচারিগণ বুঝিয়াও অন্যায় কার্য্য করিতে বাধ্য হয়েন—বিচার্য্য বিষয়ের সত্যতা স্পষ্ট বুঝিয়াও অনেক বিচারক এই ভয়ে সত্য নির্ণয়ে সাহসী হয়েন না; যেরূপ নিষ্পত্তি করিলে নিষ্পত্তিপত্র উচ্চ আদালতের চক্ষে সমধিক যুক্তিযুক্ত বোধ হইবে, সেইরূপ নিষ্পত্তি করিতে সযত্ন হয়েন। এই কারণে যাহার ১০০ টাকা আয় নাই অনেক কর্ম্মচারী তাহার প্রতি ১০০০ টাকার টেক্স ধার্য্য করেন, যে বাস্তবিক অপরাধী নহে অনেক পুলিস কর্ম্মচারী তাহাকে অপরাধী প্রতিপন্ন করেন। পদোন্নতির আশায় অনেক পুলিসকর্ম্মচারী অনেক নিরপরাধীকে প্রাণবধ ও চিরনির্ব্বাসন দণ্ডে দণ্ডিত করিয়া থাকেন।

রাজনিয়মের আরও এত দোষ আছে যে, সে সকলের আলোচনা করিতে হইলে একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে। সুতরাং আর দুই একটী মাত্র দেখাইয়া ক্ষান্ত হইব। অপরাধী বলিয়া কোন ব্যক্তি অভিযুক্ত হইলে অপরাধবিশেষে তাহাকে বিচারকাল পর্য্যন্ত প্রতিভূ দ্বারা মুক্ত থাকিতে হয় ও অপরাধ বিশেষে যে পর্য্যন্ত সে নির্দ্দোষীরূপে প্রতিপন্ন না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহাকে লৌহ শৃঙ্খলে আবদ্ধ হইয়া কারাযন্ত্রণাভোগ করিতে হয়। অপরাধী বলিয়া বিচারালয়ে আনীত হইলেই—প্রকৃত অপরাধী কি না তাহা স্থির না করিয়াই কারাগারে নিক্ষিপ্ত করা হয়। পুলিসের কুমন্ত্রণায় কত ভদ্র-লোক ঐরূপে বৃথা কত কষ্ট পাইয়া থাকে। বিচার করিবার পূর্ব্বেই—দোষী রূপে প্রতিপন্ন না হইতেই, যে, নিরীহ ব্যক্তিগণ এইরূপে অপমানিত ও পৈশাচিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়, ইহা অপেক্ষা বিড়ম্বনা আর কি আছে? এইরূপ উপায় অবলম্বনে যদি মানবকে কর্ত্তব্য পরায়ণ হইতে হয়, তাহা হইলে মানবজীবন অপেক্ষা কি পশুজীবন ভাল নয়? অনেক সাধুব্যক্তি মিথ্যা-দূষিত হইয়া এইরূপ যন্ত্রণায় ও অপমানে ম্রিয়মাণ হইয়া চির জীবনের জন্য নষ্ট হইয়া যান। আবার অনেক সাধু ব্যক্তি দৈব দুর্ঘটনা বশতঃও কখন কখন আইনবিরুদ্ধ কার্য্য করিয়া বসেন। তিনি হয়ত সেই দৈব দুর্ঘটনা সংঘটন জন্য কত আক্ষেপ করিয়াছেন, ও কত মনস্তাপ পাইয়াছেন সে অপরাধের ক্ষতিপূরণ করিবার জন্য কত যত্ন ও কত চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু রাজকর্ম্মচারী সে সকল কিছুই দেখেন না তিনি আইনের দাস, তিনি যেমন প্রমাণ পাইলেন তদনুরূপ বিচার করিলেন। সাধু দণ্ডবিধির কঠিন দণ্ডে দণ্ডিত হইয়া লজ্জা ও ক্ষোভে ম্রিয়মাণ হয়েন।

এত গেল অপরাধিদলভুক্ত লোকদিগের কথা। যাঁহারা অপরাধী রূপে বিচারালয়ে আনীত নহেন, যাঁহারা অপরাধীর অপরাধ ও নিরপরাধীর নিরপ-রাধ প্রমাণ রূপ অত্যাবশ্যক বৈধকার্য্য সম্পাদন জন্য বিচারালয়ে আনীত হয়েন, সেই অত্যাবশ্যক সাক্ষীদিগের প্রতি যে সকল অত্যাচার সংঘটিত হয় তাহাও নিতান্ত সামান্য নহে। অনেক ভদ্র সাক্ষী অপরাধী অপেক্ষাও অধিক অত্যাচারিত হয়েন। প্রথমে তিনি (প্রায়ই বৃক্ষতলে) প্রহরীর জিম্মায় রক্ষিত হয়েন, পরে তাঁহাকে সাক্ষীর আসন নামক অপমান সূচক স্থানে দণ্ডায়মান থাকিয়া নিয়ত বিপক্ষের উকীলের বক্রোক্তি ও শ্লেষ

বাক্য দ্বারা মর্ম্মাহতরূপে হাস্যাস্পদ ও অপমানিত হইতে হয়। কেন লোকে সাক্ষী দিতে আসিয়া এরূপে লাঞ্ছিত হয়েন? যিনি যথার্থ সাক্ষী দিতে আইসেন, তাঁহার অপরাধ কি? সত্য কথা বলিয়া নিরপরাধীকে মুক্ত বা অত্যাচারকারীকে দণ্ডিত করিয়া সমাজের স্থিতি সম্পাদনের চেষ্টা করিতে আসিয়া তিনি এমত কি অপরাধ করেন যে, তজ্জন্য এরূপে নিগ্রহিত হয়েন? ইহা কি রাজশাসনের ভয়ানক কলঙ্কের কথা নহে? ইহা কি মানবের পক্ষে ভয়ানক বিড়ম্বনা নহে?

রাজশাসনের এইরূপ শত শত প্রকার ভয়ানক দোষ পরিলক্ষিত হয়। রাজশাসনের অত্যাচারে দেশের এমন দুরবস্থা হইয়াছে যে, ভাবিলে শরীর রোমাঞ্চিত হয়। আজি প্রজাতে ভূম্যধিকারীতে, উত্তমর্ণে অধমর্ণে, প্রতিবেশীতে প্রতিবেশীতে এবং স্বজাতি ও আত্মীয়বর্গের পরস্পরের মধ্যে ভয়ানক বিদ্বেষানল প্রজ্বলিত হইয়াছে। পরস্পর সকলেই সকলের অনিষ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। পূর্ব্বে ভূম্যধিকারী প্রজার এবং উত্তমর্ণ অধমর্ণের পিতৃতুল্য ছিল, এক্ষণে পরস্পর পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বী শত্রু হইয়াছে। রাজা যত ভূম্যধিকারীদিগের অত্যাচার হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবার যত্ন করিতেছেন, ততই পরস্পরের অসদ্ভাব ও ক্ষতি বৃদ্ধি হইতেছে; যত অধমর্ণদিগকে উত্তমর্ণদিগের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন, ততই তাহাদের মধ্যে বিবাদ বৃদ্ধি পাইতেছে। প্রজা ভূম্যধিকারীকে ও ভূম্যধিকারী প্রজাকে, উত্তমর্ণ অধমর্ণকে ও অধমর্ণ উত্তমর্ণকে, প্রতিবাসী প্রতিবাসীকে এবং আত্মীয় আত্মীয়কে কিছুমাত্র বিশ্বাস করে না। অধিক কি পিতাপুত্র ও পতিপত্নীর মধ্যেও পরস্পরের বিশ্বাস নাই। বিশ্বাস বৃত্তি এককালে মানবহৃদয় হইতে চলিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়। মানবের সংস্কার হইয়াছে যে, বিশ্বাস করিলেই ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। এই জন্য যে ব্যক্তি লোককে অধিক বিশ্বাস করে সে এক্ষণে মূর্খ ও নির্ব্বোধ নামে অভিহিত হইয়া সাধারণের নিন্দাস্পদ হয়।

রাজশাসনের আর এক প্রবল দোষ এই যে উহার অধিক বিধিই মানবকে দুষ্কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার উপযোগী, সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক বিধি নিতান্ত অল্প। অধিক কি উপাধি দিবার নিয়ম ভিন্ন সৎকর্ম্মে প্রবৃত্তিদায়ক অন্য

কোনরূপ বিধি নাই বলিলেই হয়। সে বিধিও সুফলপ্রদ নহে। কারণ প্রথমতঃ ঐ সমস্ত সৎকর্ম্ম ধনসাপেক্ষ—ধনী ব্যক্তি ভিন্ন সে সুযোগ অন্যের হইবার সম্ভাবনা নাই; দ্বিতীয়তঃ অন্যায় কার্য্য করিয়াও অনেকে বিচারপ্রণালীর দোষে উপাধি লাভ করে। অনেক মুচিরাম গুড়কে রায় বাহাদুর, রাজা বাহাদুর প্রভৃতি হইতে দেখা যায়। সুতরাং রাজশাসন মানবকে কিয়ৎ পরিমাণে কুকর্ম্ম করণে নিবৃত্ত রাখিতে পারিলেও কিছুমাত্র কর্ত্তব্যপরায়ণ করিতে পারে না। উহা দ্বারা বিবেক স্ফূর্ত্তি প্রাপ্ত ও তেজীয়ান না হইয়া একান্ত নিস্তেজ হইয়া পড়ে—মানব পশু তুল্য হয়।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, রাজশাসনের ঐ সকল দোষযুক্ত নিয়মগুলি সংশোধিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে ভালরূপ নিয়ম করিলে রাজনিয়ম দোষশূন্য হইতে পারে। আমাদের বোধ হয় তাহা নিতান্ত অসম্ভব। কারণ যে সকল নিয়মের দোষোল্লেখ করা হইল, সে সকল নিয়ম যদি না থাকে তাহা হইলে আরও অধিক অত্যাচার সংঘটিত হয়। তৎসমস্ত বিস্তারিতরূপে বুঝাইতে গেলে প্রবন্ধ অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া পড়ে। এইজন্য সংক্ষেপে দুই এক কথা বলিয়াই ক্ষান্ত হইব।

যদি অভিযোগ উপস্থিত করিবার জন্য নির্দ্দিষ্ট সময় নির্দ্ধারিত না করা যায়, তাহা হইলে কোন কালেই কাহারও অভিযোগের আশঙ্কা যায় না এবং অনেক কাল বিলম্বে ঘটনার সত্যতা প্রমাণের উপায় না থাকায় সুবিচারের সম্ভাবনাও থাকে না। যদি অবস্থা বিশেষে নির্দ্দিষ্ট বিচারালয়ে অভিযোগ উপস্থিত করিবার নিয়ম না করা যায়, তাহা হইলে যেখানে অভিযোগ উপস্থিত করিলে প্রত্যর্থীর নানা প্রকার অসুবিধা ও কষ্ট জন্মিতে পারে অর্থী তথায় অভিযোগ উপস্থিত করিয়া প্রত্যর্থীকে বিপদাপন্ন করিতে পারে এবং সামান্য বিষয়ের বিচারের জন্য সমধিক বেতনভোগী বিচারকের অযথা সময় নষ্ট জনিত ক্ষতি হয়। যদি ব্যবসায়ী ব্যবহারজীবনিয়োগের নিয়ম না থাকে, তাহা হইলে অনেক অজ্ঞ ব্যক্তি প্রকৃত বিষয় বুঝাইয়া দিতে না পারিয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এক কথা বার বার বলিয়া বিচারকের সময় বৃথা নষ্ট করে। সাক্ষী যাহা বলিবে তাহাই যদি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করা যায়, বক্রোক্তি প্রভৃতি দ্বারা তাহাদিগের পরীক্ষা করা না হয়, তাহা হইলে সাক্ষী সত্য বলিল কি না বুঝিতে পারা যায় না, সুতরাং

সুবিচার হইবার সম্ভাবনাই থাকে না। উচ্চ কর্ম্মচারিগণ যদি নিম্ন কর্ম্মচারীদিগকে ধমক না দেন, তাহা হইলে অনেক কর্ম্মচারী অর্থলোভে ও আত্মীয়দিগের অনুরোধে অনেকের প্রতি অত্যাচার ও অবিচার করিতে পারেন। এই রূপে অনুসন্ধান করিলে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, যে সকল নিয়ম মানবের অত্যাচারের কারণ হইয়াছে, সেই সকল নিয়মই আবার অত্যাচার নিবারণের জন্য একান্ত আবশ্যক। যদি সে সকল নিয়ম রহিত করা হয়, তাহা হইলে মানবের আরও কষ্ট বৃদ্ধি হয় ও রাজশাসনের ভয়ানক ব্যাঘাত জন্মে।

যদিও স্বীকার করা যায় যে, রাজবিধিগুলিকে দোষশূন্য করিতে পারা যায়, তাহা হইলেও তাহা মানবকে কর্ত্তব্য পরায়ণ করিবার উপযোগী হয় না, অর্থাৎ রাজার সুশাসনে মানবগণের অন্যায়াচরণপ্রবৃত্তি কিয়ৎ পরিমাণে দমিত হইতে পারিলেও তদ্দ্বারা সুপ্রবৃত্তি বর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা নাই। ঈশ্বরে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিবে, পিতা মাতাকে ভক্তি করিবে, স্বামী বা স্ত্রীকে ভাল বাসিবে, পুত্র কন্যাকে স্নেহ করিবে, প্রতিবাসী ও মানবমণ্ডলীকে আপনার ন্যায় দেখিবে, দরিদ্রদিগকে দান করিবে, সকলের সহিত সুমিষ্ট আলাপ করিবে, ধনের সুব্যবহার করিবে ইত্যাদি বৈধ বিষয়ে মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার উপযোগী কোন সুব্যবস্থা আইন দ্বারা হইতে পারে না। কেন না যিনি ঐ সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম না করিবেন তিনি দণ্ড প্রাপ্ত হইবেন যদি এরূপ আইন করা হয়, তাহা হইলে মানবের কিঞ্চিন্মাত্রও স্বাধীনতা থাকে না, প্রতি পাদবিক্ষেপে মানব বাধা প্রাপ্ত হয়। যদি পুরস্কারব্যবস্থা দ্বারা ঐ সকল কার্য্যে প্রবৃত্তি দেওয়ার চেষ্টা হয়, তাহা হইলে পুরস্কার প্রাপ্তির আশায় এত আবেদন উপস্থিত হয় ও তাহার প্রমাণ ইত্যাদির জন্য এত ব্যয়াদি করিতে হয়, যে তাহাতে অর্থী, প্রত্যর্থী ও বিচারক সকলেই বিপন্ন হইয়া পড়েন, সুতরাং ঐ পুরস্কারবিধি দণ্ডবিধির ন্যায় বা তদপেক্ষা অধিক অত্যাচারের কারণ হইয়া পড়ে। আবার কোন্ অবস্থায় কিরূপ কার্য্য করা উচিত তাহার স্পষ্ট নিরাকরণ করিয়া দেওয়াও সহজ নহে। কেন না কোনও কার্য্যই সকল অবস্থায় ও সকল সময়ে কর্ত্তব্য নহে। যে কার্য্য এক সময়ে কর্ত্তব্য, অবস্থা বিশেষে তাহা একান্ত অকর্ত্তব্য।

কেহ কেহ বলেন রাজশাসনের পরিবর্ত্তে সমাজশাসন স্থাপিত হইলে তদ্দ্বারা মানব নিয়মিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা যে সত্য নহে তাহা বোধ হয় বুঝাইবার আবশ্যকতা নাই। কেন না প্রথমতঃ সভ্য সমাজের সমাজ-শাসন ও রাজশাসন একই কথা। দ্বিতীয়তঃ সমাজও রাজার ন্যায় পূর্ব্বোক্ত-রূপ নিয়মাবলী অবলম্বনে সমাজস্থ লোকের শাসন করিবেন, নূতন কোন প্রণালী অবলম্বন করিবার শক্তি সমাজের নাই। সুতরাং তাহাতে ঐরূপ দোষেরই সম্ভাবনা।

এই প্রকারে আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, কি স্বাধীন শিক্ষা কি কোন প্রকার দণ্ডপুরস্কারবিধান কিছুই মানবের বিবেককে স্ফূর্ত্তিমান ও শক্তিসম্পন্ন করিতে পারে না। কিন্তু দেখা যাইতেছে বাল্যকাল হইতে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া যে জ্ঞানের অনুশীলন করা যায়, তদ্দ্বারা বিবেক বিলক্ষণ শক্তিসম্পন্ন হয়। সকল প্রকার মনোবৃত্তিই সেরূপ বিবেকের কাছে পরাজয় লাভ করে। মুসলমানগণ বাল্যকাল হইতে জানে, বিধর্ম্মীর (কাফে-রের) প্রাণবধ ও সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিলে ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্য করা হয়। বাল্য-কাল হইতে ঐ জ্ঞানের অনুশীলন করিয়া তাহাদের বিবেক এমন শক্তি-সম্পন্ন হয় যে, কোন বৃত্তিই তাহার অবাধ্য হইতে পারে না। তাই তাহারা কাফেরের বধরূপ কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবার সময় দয়া, প্রেম,প্রভৃতি অতি পবিত্র বৃত্তি সকলেরও বাধা গ্রাহ্য করে না। খৃষ্টউপাসকগণ বাল্যকাল হইতে শিখিয়া আসিতেছেন যে, খৃষ্টের উপাসনা ভিন্ন মানবের উদ্ধারের উপায়ান্তর নাই; সেই জন্য তাঁহারা বিধর্ম্মীদিগকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করা অতি কর্ত্তব্য বিবেচনা করেন। সেই কর্ত্তব্যের অনুরোধে তাঁহারা মাতার ক্রোড় হইতে শিশু সন্তান ও পত্নীর হৃদয় হইতে হৃদয়সর্ব্বস্ব পতি হরণ প্রভৃতি শত শত প্রকার কুকার্য্য করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না। এমন কি ঐ কর্ত্তব্য সাধন উদ্দেশে তাঁহারা রাজার রাজ্যহন্তারক ও লক্ষ লক্ষ মনুষ্যের প্রাণনাশকর যুদ্ধ করিতেও বিমুখ হয়েন না। সুতরাং স্পষ্টই বুঝা যাই-তেছে যে, বাল্যসংস্কার ও বাল্যকালের অনুশীলন বিবেকের স্ফূর্ত্তি বিধানের উৎকৃষ্ট উপায়। অতএব যদি মানব বাল্যকাল হইতে সত্য জ্ঞান লাভ করিয়া তদনুযায়ী অনুশীলন করিতে পারে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই বিবেক যথাস্ফূর্ত্ত ও শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে। কোন মনোবৃত্তিই সেই সত্যজ্ঞান-

পূর্ণ শক্তিসম্পন্ন বিবেকের অবাধ্য হইয়া মানবকে কুকার্য্যে রত করিতে পারে না। অর্থাৎ মানব যদি বাল্যকাল হইতে এমন জ্ঞান লাভ করিতে পারে যে, তাহা খৃষ্ট ও মহম্মদের বাক্যের ন্যায় সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য ও ঐ সকলের ন্যায় ভ্রান্ত না হইয়া সম্পূর্ণ সত্য হয়, তাহা হইলে বিবেক সেই জ্ঞানবলে জ্ঞানবান্ ও তাহার অনুশীলনে শক্তিসম্পন্ন হইয়া কর্ত্তব্যরত হইতে পারে। অতএব পরমেশ্বর আমাদের বিবেকের স্ফূর্ত্তিবিধান ও শক্তি বৃদ্ধি করিবার অভিপ্রায়ে যে সকল সত্যজ্ঞান ও উপযোগী অনুশীলনবিধি প্রচার করিয়াছেন, সেই জ্ঞান লাভ ও তদনুরূপ অনুশীলন করিতে পারিলেই আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি। সেই সকল ঈশ্বরকৃত বিধিবাক্য ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র পরায়ণতাই মানবের মানবত্ব সম্পাদনের একমাত্র হেতু। পিতামাতা ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়া পুত্রদিগকে উপযুক্তরূপে শিক্ষিত ও অনুশীলিত করিবেন, গুরু শিষ্যদিগকে তাহার বিস্তারিত উপদেশ প্রদান করিবেন, সমাজ তৎপরায়ণ হইয়া পরস্পর পরস্পরকে তদ্বিষয়ে সহায়তা করিবেন এবং রাজা ধর্ম্ম-ভূষণে ভূষিত হইয়া প্রজাগণকে কর্ত্তব্যকার্য্যে রত করিবার যত্ন করিবেন। সকল দিক্ হইতে একমাত্র সত্যভাবে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার চেষ্টা হইলে, কেহই অন্যায় কার্য্য করিতে পারে না; সকলেই ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত বিমল সুখ লাভ করিয়া জন্মের চরিতার্থতা সম্পাদন করে। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রপরায়ণ হওয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য।

পরমেশ্বর যে আমাদের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এ কথা অনেকেই প্রমাণশূন্য বলেন। কিন্তু বাস্তবিক যদি তাঁহাদের কথা সত্য হয়, অর্থাৎ পরমেশ্বর আমাদের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন এবিষয়ের কোন প্রমাণ নাই বলিতে হয়, তাহা হইলে আমরা আছি তাহারও কোন প্রমাণ নাই বলিতে হইবে। কেন না বাস্তবিক আমরা যে আছি তাহার প্রমাণ কি? যদি বল আমরা যে অনুভব করি তাহাই আমাদের অস্তিত্বের প্রমাণ, তবে লৌহের অস্তিত্বের প্রমাণ কি? ঐ লৌহখণ্ড কি নিজে কিছু অনুভব করিতেছে? যদি না করে, তবে লৌহখণ্ড যে আছে তাহার প্রমাণ কি? যদি বল, আমরা যে লৌহের অস্তিত্ব অনুভব করি, তাহাই লৌহের অস্তিত্বের প্রমাণ; কিন্তু তাহা হইলে মরীচিকারও অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়।

বিশেষতঃ যাহা অনুভবযোগ্য তাহাই যে সত্য তাহারই প্রমাণ কি? এইরূপ কুতর্ক অবলম্বন করিলে কিছুতেই আমাদের অস্তিত্ব সপ্রমাণ হয় না। এই শ্রেণীর কূটতর্ক অবলম্বন করিয়াই ধর্ম্মবিরোধীরা ধর্ম্মশাস্ত্রকে প্রমাণশূন্য বিবেচনা করেন, কিন্তু সেরূপ তর্ক বৈজ্ঞানিকতর্ক নহে। যে বৈজ্ঞানিক যুক্তি ঈশ্বর ও বিশ্বের অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিতেছে, সেই বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতা সপ্রমাণ হয়। তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ ব্যক্তি ভিন্ন অন্যকে তাহা বুঝান অসম্ভব, এই জন্য স্থূল স্থূল কয়েকটী কথা মাত্রের আলোচনা করিয়া ক্ষান্ত হইতে হইল।

পূর্ব্বে যতদূর আলোচনা করা গিয়াছে, তাহাতে স্পষ্টই বুঝা গিয়াছে যে, ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদনই আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য; ঈশ্বর যাহাকে যেরূপ শক্তি দিয়াছেন, সেই শক্তি প্রকাশ করিলেই তাহার ঈশ্বরকার্য্য করা হয়; তিনি মানবে যে সকল শক্তি প্রদান করিয়াছেন, তৎসমস্ত পরস্পর বিরোধী এই জন্য বিবেকের পরামর্শানুসারে তাহাদের উপযুক্ত পরিচালন কর্ত্তব্য; জ্ঞানলাভ ও তাহার সম্যক্ অনুশীলন না হইলে বিবেক স্ফূর্ত্তিমান ও কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন করিবার উপযোগী শক্তি সম্পন্ন হয় না, এজন্য সত্য জ্ঞান লাভ করা আবশ্যক। কিন্তু কেহই স্বয়ং চেষ্টা করিয়া সত্যজ্ঞান লাভ করিতে সমর্থ হয় না; পূর্ব্ব পণ্ডিতগণের নির্ণীত তত্ত্বও সমস্ত সত্য নহে ও তাহাতে মানবের দৃঢ় প্রত্যয় জন্মে না। সুতরাং ধর্ম্মশাস্ত্র সত্য নহে—ঈশ্বরের কৃত নহে বলিলে পরমেশ্বর মানবের রক্ষা বিধানের উপযোগী কোন উপায়ই করেন নাই, বলিতে হয়। তাহা হইলে পশু পক্ষ্যাদি ইতর প্রাণী ও উদ্ভিদ্ অপেক্ষাও মনুষ্যকে দুর্ভাগ্য ও হীন বলিতে হয়। কারণ পশ্বাদি প্রাণিগণের যেরূপ কার্য্য উপযোগী তাহা দ্বারা তাহা সম্পন্ন করাইবার জন্য ঈশ্বর তাহাদের হৃদয়ে প্রাকৃতিক বৃত্তি বিশেষ (Instinct) দিয়াছেন, সেই বৃত্তিবলে কর্ত্তব্য জ্ঞাত হইয়া তাহারা রক্ষিত ও কর্ত্তব্যরত হয়। সেই জন্য কোন জন্তুই নির্দ্দিষ্ট প্রকৃতির প্রতিকূল যথেচ্ছাচার করিয়া দুঃখ পায় না। কিন্তু মানবের যখন সেরূপ বৃত্তি বিশেষ নাই, জ্ঞানলাভ না করিলে যখন মানব হিতাহিত মাত্র বুঝিতে পারে না, তখন সেই অত্যাবশ্যক জ্ঞান লাভের উপায় যদি ঈশ্বর না করিয়া থাকেন, তবে কিরূপে মানব রক্ষিত হইবে? অতএব যুক্তি মানিতে হইলে অবশ্যই

বলিতে হইবে ঈশ্বর মানবের জ্ঞানলাভের উপায় করিয়া দিয়াছেন—অবশ্যই বলিতে হইবে ঈশ্বর মানবের রক্ষাবিধানের উপায় করিয়াছেন। নচেৎ কখনই মানব রক্ষিত হইত না, অমৃত ভাবিয়া বিষপান করিয়া প্রাণ হারাইত। যদি ধর্ম্মভূষণে ভূষিত না হইত তাহা হইলে মানব সিংহ ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষাও ভয়ানক হইত, কোন মানবই মানবান্তরের সংস্রবে থাকিতে সাহস করিত না। সিংহ ব্যাঘ্রাদিকে হিংস্র বলিয়া জানি, এজন্য আমরা তাহাদের নিকটবর্ত্তী হই না, গোমেষছাগাদিকে নিরীহ বলিয়া জানি, এজন্য তাহাদের সহিত একত্রে বাস করি। কিন্তু মানবে যে হিংস্রত্ব ও নিরীহত্ব উভয় শক্তিই আছে। কি প্রকারে জানিব মানব কখন হিংস্র ও কখন নিরীহ? নিরীহ ভাবিয়া যাহাকে মনঃপ্রাণ সমর্পণ করিব, সেই যে হিংস্র হইয়া প্রাণ নাশ করিবে। অতএব যখন ধর্ম্মশাস্ত্রাবলম্বন ভিন্ন মানবের রক্ষিত হইবার আর কোন ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায় দেখিতে পাওয়া যাইতেছে না ও যখন ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে মানব সমাজ রক্ষিত হইতেছে দেখা যাইতেছে তখন ধর্ম্মশাস্ত্রকে নিশ্চয়ই ঈশ্বরের প্রণীত বলিতে হইবে।

এ মীমাংসা অনুমানসিদ্ধ নহে, স্পষ্টই প্রত্যক্ষসিদ্ধ। স্বাভাবিক নিয়মের সহিত ইহার সঙ্গতিও দেখা যাইতেছে। কেন না আমরা অণ্ডজ ও স্তন্যপায়ী এই দুই প্রকার প্রাণী দেখিতে পাই। অণ্ডজগণ অণ্ডমধ্যে থাকিয়া আপনারা পুষ্ট হয়, স্তন্যপায়ীরা সেরূপে আপনা হইতে পুষ্ট হয় না, স্বতন্ত্র স্তন্যপানে পুষ্ট হয়। কিন্তু ঐ উভয় উপায়ই ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট। ঐরূপ ইতর প্রাণিগণ আপনা হইতে রক্ষিত হয়, মানব আপনা হইতে রক্ষিত না হইয়া স্বতন্ত্র ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে রক্ষিত হয়; অর্থাৎ অণ্ডজগণের রক্ষার উপযোগী সমস্ত বিষয় যেমন সেই অণ্ড মধ্যেই থাকে, ইতর প্রাণীর রক্ষণোপযোগী সমস্তই (Instinct) সেইরূপ তাহাদের মধ্যেই বর্ত্তমান থাকে এবং স্তন্যপায়িগণের রক্ষণোপযোগী খাদ্য যেমন মাতৃস্তন্যরূপ বাহ্য বিষয়ে বর্ত্তমান থাকে, মানবগণের রক্ষণোপযোগী সমস্তই (Instict বা conscienceএর ন্যায় কর্ত্তব্য পথে পরিচালনের উপযোগী জ্ঞান) ধর্ম্মশাস্ত্ররূপ বাহ্য বিষয়ে বর্ত্তমান আছে। এই উভয় উপায়ই ঈশ্বরের নির্দ্দিষ্ট। অণ্ডজগণ যেমন প্রসূত হইবা মাত্র আপনাদের আহার সংগ্রহে সমর্থ হয়, ইতর প্রাণিগণ সেইরূপ জন্মলাভ করিবা মাত্র আপন

প্রকৃতি অবলম্বনে কর্ত্তব্য কার্য্য করিতে পারে এবং স্তন্যপায়িগণ যেরূপ শৈশবকালে মাতৃ-স্তন্যপান দ্বারা উপযোগী শক্তিলাভ করিয়া স্বয়ং আহার সংগ্রহে সমর্থ হয়, মানব সেইরূপ বাল্যকালে ধর্ম্মশাস্ত্রব্যবস্থানুসারে জ্ঞান লাভ ও তদনুযায়ী অনুশীলন করিয়া বিবেকবান হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্য সম্পাদনের উপযোগী হয়। এই পার্থক্যই মানব ও ইতর প্রাণীর ভিন্নতার একমাত্র হেতু। অতএব ঈশ্বর যে আমাদের জন্য ধর্ম্মমাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন তাহাতে আর সন্দেহ নাই। ঈশ্বর স্বয়ং হস্ত দ্বারা লিখিয়া প্রচার না করিলেও মহাপুরুষের আবির্ভাব করিয়া তদ্দ্বারা ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন।

ঈশ্বর-কার্য্য সম্পাদন ও ঈশ্বরদত্ত শক্তিসকলের পরিচালনই আমাদের এক মাত্র কর্ত্তব্য এ কথা স্বীকার করিতে যাঁহারা প্রস্তুত নহেন, তাঁহাদিগকেও ধর্ম্মশাস্ত্রের সত্যতা স্বীকার করিতে হইবে। কেন না তাঁহাদের সহিত উক্ত উদ্দেশ্য বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও মানবের যে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য আছে—হিতকর ও অহিতকর বিষয় আছে, এ বিষয়ে কোন মতভেদ নাই। সুতরাং হিতাহিত বুঝা যে মানবের আবশ্যক সে বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে না। কিন্তু যখন দেখা যাইতেছে যে, পশ্বাদির ন্যায় হিতাহিত নির্ব্বাচন করিবার উপযোগী শক্তি মানবের নাই, তখন মানবের হিতাহিত বুঝিবার উপযোগী অন্য কোন উপায় যে আছে, একথা অবশ্য তাঁহাদিগকে স্বীকার করিতে হইবে; এবং যখন ধর্ম্মশাস্ত্র ভিন্ন তাহার অন্য কোন উপায় লক্ষিত হয় না ও যখন পৃথিবীর সকল লোকেই একবাক্যে বিশ্বাস করিয়া আসিতেছে, ঈশ্বর মানবের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন নিশ্চয়ই ধর্ম্মশাস্ত্রকে ঈশ্বরপ্রণীত বলিতে হইবে। বিশ্বজনীন বাক্য কখন মিথ্যা হইতে পারে না। কল্য সূর্য্য উদিত হইবে কি না তাহা আমরা জানি না, অথচ যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবলে আমরা বলিতেছি, কল্য নিশ্চয়ই সূর্য্য উদিত হইবে, সেই বৈজ্ঞানিক প্রমাণ বলে বলিতে পারি, ঈশ্বর নিশ্চয়ই আমাদের জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন। অর্থাৎ যখন দেখা যাইতেছে, আমাদের কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য আছে ও যখন আমরা নির্দ্দিষ্ট মনোবৃত্তি বিশেষের সাহায্যে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে পারি না, তখন অবশ্যই বলিতে হইবে পরমেশ্বর আমাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভের অন্য উপায় করিয়া দিয়াছেন এবং যখন চিরকাল সকল দেশের লোকে ধর্ম্মশাস্ত্রকেই সেই উপায় বলিয়া নির্দ্দেশ

করিয়া আসিতেছে ও অন্য কোন উপায় এ যাবৎ আবিষ্কৃত হয় নাই, তখন ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত এ কথা বলা ভিন্ন উপায়ান্তর নাই। সুতরাং ইহা সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত।

কেহ কেহ বলেন পশুপক্ষ্যাদির ন্যায় মানবের হৃদয়ে হিতাহিতজ্ঞান (conscience) নামক প্রাকৃতিক বৃত্তি বিশেষ আছে, তদ্দ্বারাই মানব কর্ত্তব্য নির্ণয় করিয়া থাকে। আমাদের মতে সে কথা নিতান্ত ভ্রান্তিমূলক। কেন না হিতাহিত জ্ঞানের কোন কার্য্যই আমরা কখনও দেখিতে পাই না; বিশেষতঃ ঐরূপ প্রাকৃতিক বৃত্তিবিশেষই যদি মানবের কর্ত্তব্যপরায়ণতার কারণ হইত, তাহা হইলে মানব এক প্রকার পশু বিশেষ মধ্যেই পরিগণিত হইত। কেননা সেই প্রাকৃতিক শক্তির অধীন হইয়া সকল মানব পশ্বাদির ন্যায় একই প্রকার নিয়মে কার্য্য করিত। সুতরাং যে গুণে মানব শ্রেষ্ঠত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে তাহা মানবে থাকিত না; বানর যেমন অন্যান্য পশু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, মানব সেইরূপ বানর অপেক্ষা কিয়ৎপরিমাণে শ্রেষ্ঠতালাভ করিত মাত্র। এ বৈচিত্র ও এ দেবভাব মানবে পরিলক্ষিত হইত না। অতএব এ কথা নিতান্ত অশ্রদ্ধেয়। মানবতত্ত্বে এবিষয়ের সম্যক আলোচনা করা হইয়াছে তাহা দেখিতে অনুরোধ করি।

আধুনিক নব্যসম্প্রদায় বলেন, ধর্ম্মশাস্ত্রের মতানুসারে চলিলে মানবের স্বাধীনতা থাকে না। কেন না যাহা আমার বিবেচনায় কর্ত্তব্য কার্য্য, ধর্ম্ম-শাস্ত্রে তাহা অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে, সুতরাং তদনুযায়ী কার্য্য করিলে জ্ঞান ও বিশ্বাসের বিপরীত কার্য্য করা হয়। আমরা ইচ্ছাপূর্ব্বক সেরূপ কার্য্য করি না, নিতান্ত ক্ষুণ্নমনে ভয়েরই পরতন্ত্র হইয়া করিয়া থাকি, সুতরাং তাহা অত্যন্ত ক্লেশকর।

আমাদের বোধ হয় নব্য সম্প্রদায়ের এ কথা সম্পূর্ণ ভ্রান্তিমূলক। কেন না ধর্ম্মশাস্ত্র অনুসারে চলিলেই মানবের স্বাধীনতা রক্ষিত হয়, অন্যরূপে চলিলে স্বাধীনতার বিঘ্ন ঘটে। কারণ যখন স্ব+অধীনতা=স্বাধীনতা, তখন আপনার অধীন থাকাকেই অবশ্য স্বাধীনতা বলে। কিন্তু আমার নিজের অধীনতা বলিলে কি বুঝায়? আমি ত ভিন্ন ভিন্ন শক্তির অধীন। তবে কি ভিন্ন ভিন্ন বৃত্তির অধীনতাকে স্বাধীনতা বলে? আমাদের বোধ হয় তাহা কখনই নহে। কেন না তাহা হইলে যখনই ক্রোধ উত্তেজিত হইবে, তখনই

ক্রোধের অধীন হইতে হইবে, যখনই লোভ উত্তেজিত হইবে তখনই লোভের অধীন হইতে হইবে, যখন যে বৃত্তি উত্তেজিত হইবে তাহারই পরতন্ত্র হইতে হইবে। সুতরাং এরূপ স্বাধীনতা পরাধীনতার নামান্তর। বিশেষতঃ এক বৃত্তির স্বাধীনতা রক্ষা করিলে অন্য বৃত্তির স্বাধীনতা নষ্ট হয়—অহঙ্কারের স্বাধীনতা রক্ষা করিলে বিনয়ের স্বাধীনতা নষ্ট হয়, স্বার্থপরতার স্বাধীনতা রক্ষা করিলে পরোপকারেচ্ছার স্বাধীনতা নষ্ট হয়। অতএব বৃত্তি সকলের অধীনতা স্বাধীনতা নহে, সম্পূর্ণ পরাধীনতা। বিবেকের অধীনতাই প্রকৃত স্বাধীনতা। যে ব্যক্তি বিবেকের মতানুযায়ী কার্য্য করিতে পারে সেই ব্যক্তিই প্রকৃত স্বাধীন। সুতরাং যদি ধর্ম্মশাস্ত্রের মত বিবেকের মতের বিরোধী হয়, তবে ধর্ম্মশাস্ত্রকে স্বাধীনতাপহারী বলিতে হইবে। কিন্তু যখন ধার্ম্মিকগণের বিবেক ধর্ম্মশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া জ্ঞান সম্পন্ন হইয়াছে, তখন তাঁহাদের বিবেকানুমোদিত মত ও ধর্ম্মশাস্ত্রের মত সর্ব্বতোভাবে এক প্রকার। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্র স্বাধীনতার বিঘাতক নহে, প্রত্যুত উহাই স্বাধীনতার একমাত্র সংরক্ষক। যাহারা প্রকৃত জ্ঞান লাভ করে নাই, তাহাদের বিবেক অজ্ঞানতাদুষ্ট এ জন্য ধর্ম্মশাস্ত্র তাহাদেরই স্বাধীনতা বিনষ্ট করে। সে সকল স্বেচ্ছাচারপরায়ণগণের স্বাধীনতা নিয়তই নষ্ট হইয়া থাকে—আপন আপন মনোবৃত্তি, সমাজ, রাজা সকলেই তাহাদের স্বাধীনতার বিঘ্ন সম্পাদন করে। যাহারা ধর্ম্মশাস্ত্রানুরূপ অনুশীলন করিয়া বিবেকবান হইয়াছে কিছুতেই তাহাদের স্বাধীনতা নষ্ট হয় না। কোনও মনোবৃত্তি—কোনও শক্তি তাহাদিগকে বিবেকের অননুমোদিত কার্য্যে প্রবৃত্ত করিতে পারে না।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

হিন্দুধর্ম্ম।

এক্ষণে এই সংশয় উপস্থিত হইতে পারে, যে, যদি ধর্ম্মশাস্ত্রই আমাদের সকল মঙ্গলের নিদান ও ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরেরই প্রণীত, তবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র কেন? সমগ্র পৃথিবীতে যে কত ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ধর্ম্মশাস্ত্র আছে তাহার ইয়ত্তা করা যায় না। যদি তৎসমস্তই ঈশ্বরের প্রণীত হয়, তবে তৎ সমস্ত পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন কেন? আর যদি সমস্তগুলি ঈশ্বরপ্রণীত না হয়, তবে কোন্ ধর্ম্মশাস্ত্র ঈশ্বরপ্রণীত তাহা মানব জানিবে কি প্রকারে?

আমাদের বোধ হয় এ সংশয় অনায়াসে নিরাকৃত হইতে পারে। কেন না, বিশিষ্টরূপে বিবেচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, পৃথিবীতে একটী ভিন্ন দুইটী ধর্ম্মশাস্ত্র নাই। যাহা আজি কালি হিন্দুশাস্ত্র নামে অভিহিত হইতেছে, উহাই সেই একমাত্র ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র। আর কোন শাস্ত্রই প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র নামে অভিহিত হইবার যোগ্য নহে। কারণ ধর্ম্মশাস্ত্র যে সকল লক্ষণবিশিষ্ট হওয়া আবশ্যক, একমাত্র হিন্দু-শাস্ত্রই সেই সকল লক্ষণসম্পন্ন; আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই সে সকল লক্ষণ-সম্পন্ন নহে। কেন না যতদূর আলোচনা করা গিয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে যে, ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা দ্বারা মানব সত্য জ্ঞান লাভ করিয়া বিবেকের স্ফূর্ত্তি বিধানোপযোগী অনুশীলন করিতে সমর্থ হয়, সেই অনুশীলনবলে মনোবৃত্তিগুলিকে বিবেকের অধীন করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত কর্ত্তব্য সাধনে সক্ষম হয় এবং সেই কর্ত্তব্য সাধন করিয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত উন্নতি পথে অগ্রসর হইয়া সুখভোগ করে। সুতরাং সত্যজ্ঞান, অনুশীলনবিধি ও উন্নতির উপায় এ তিনই ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে থাকা চাই। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রই এই ত্রিগুণসম্পন্ন নহে। এক একটী করিয়া আমরা এই সকলের আলোচনা করিতেছি।

সত্য বটে, সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেই জ্ঞানবাক্য বা নীতি উপদেশ কিছু কিছু আছে, এমন কি খৃষ্ট মহম্মদীয় ধর্ম্মশাস্ত্রমধ্যে অতি উচ্চ দরের নীতি বাক্য যথেষ্ট পরিমাণ দেখিতে পাওয়া যায়, কিন্তু তৎ সমস্ত কার্য্যে ব্যবহারের উপযোগী নহে, সুতরাং সত্যও নয়। বিষয়ী ব্যক্তিরা যেমন বিষয়বিশেষকে সকল সময়ে সকলের পক্ষে সুখকর ও বিষয়বিশেষকে সকল সময়ে সকলের পক্ষে দুঃখকর বিবেচনা করেন, ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রণেতাগণ সেইরূপ কার্য্যবিশেষকে সকলের পক্ষে সকল সময়ে কর্ত্তব্য ও পুণ্যজনক এবং কার্য্যবিশেষকে সকলের পক্ষে সকল সময়েই অকর্ত্তব্য ও পাপজনক বলেন। কিন্তু বাস্তবিক তাহা সত্য নহে, ঈশ্বরের উদ্দেশ্যও নহে। খৃষ্টধর্ম্ম বলিতেছে "এক গালে চড় মারিলে, আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া উচিত।" এই নীতি ক্রোধ নিবারণ ও ক্ষমা শিক্ষার বিলক্ষণ উপযোগী বটে, কিন্তু বোধ হয় কেহই এরূপ ক্ষমা অবলম্বন করিতে পারেন না। বিশেষতঃ এরূপ ক্ষমা অবলম্বন করিলে ক্রোধের সত্তামাত্র থাকে না, সুতরাং যে আবশ্যক কার্য্য সাধন জন্য ঈশ্বর ক্রোধ দিয়াছেন, সে কার্য্য অসমাপ্ত থাকে। ঐরূপ বুদ্ধ যে বলিয়াছেন, অহিংসা পরম ধর্ম্ম, কোনও সময়ে কোনও কারণেই একটী কীটানুরও প্রাণ বিনাশ করা উচিত নহে, এই নীতি পরানিষ্ট নিবারণের মহৌষধ হইলেও তদনুসারেও চলা মানবের অসাধ্য, সুতরাং তাহা ঈশ্বরের অনভিপ্রেত। সকল ধর্ম্ম শাস্ত্র এইরূপ অসম্ভব বিবেকবিহীন নীতিবাক্যে পরিপূর্ণ। সে সকল নীতি বাক্য পালন যোগ্য নহে, বক্তৃতারই উপযোগী। তাই ইংরাজ জ্ঞানী বলেন do what I say, not what I do অর্থাৎ আমি যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া শিখিয়াছি, তদনুরূপ কার্য্য করা অসম্ভব, তাহা মুখে শিক্ষা করা যায় ও মুখেই প্রকাশ করা যায়, অতএব যদি আমার নিকট জ্ঞান শিক্ষা করিবার ইচ্ছা থাকে, তবে আমার কার্য্য দেখিও না, আমার বাক্য শুন। আমি যাহা করি তাহা কর্ত্তব্য নয়, আমি যাহা বলি তাহাই কর্ত্তব্য। অন্য সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই এইরূপ দুর্দ্দশা—হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন আর কোন ধর্ম্ম শাস্ত্র অনুসারেই মানব কার্য্য করিতে পারে না। 'হিন্দু বলেন মহাজনো যেন গতঃ স পন্থা' অর্থাৎ ধর্ম্ম অতি দুরূহ বিষয়, বাক্য দ্বারা বুঝাইয়া দিলে তাহার মর্ম্ম হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন, কারণ এমন কোন কার্য্যই নাই যে তাহা সকল সময়ে, সকল অব-

স্থায় সকলের পক্ষে কর্ত্তব্য এবং এমন কোন কার্য্যইই নাই যাহা সকল সময়ে, সকল অবস্থায় সকলের পক্ষে অকর্ত্তব্য; সুতরাং কর্ত্তব্যপ্রণালী মুখে বুঝাইয়া দেওয়া অত্যন্ত কঠিন, কেবল উপদেশ লাভ করিয়া তাহার প্রকৃত অর্থ বুঝিতে পারা যায় না। অতএব ধার্ম্মিক পণ্ডিতগণ যেরূপ সময়ে, যেরূপ অবস্থায় যেরূপ কার্য্য করেন তাহা দেখিয়া কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে—দৃষ্টান্ত দ্বারা উপদেশের মর্ম্ম বুঝিবার চেষ্টা করিতে হইবে। কেবল মুখে বলিবার জন্য ধর্ম্ম নহে, কার্য্যই ধর্ম্ম। দেশ, কাল, পাত্র ও অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া জ্ঞানোন্নত বিবেকের সহায়তায় কর্ত্তব্য স্থির করিতে হইবে।

সকলের পক্ষে সকল সময়ে নির্দ্দিষ্ট একবিধ কার্য্য কর্ত্তব্য হইলে, মানব ও পশুতে ভেদ থাকে না। অর্থাৎ ইতর প্রাণিগণ যেমন নির্দ্দিষ্ট প্রাকৃতিক শক্তির (Instinct) অধীন হইয়া চিরজীবন একই প্রকার কার্য্য করে, যদি মানব সেইরূপ নির্দ্দিষ্ট নিয়মের অধীন হইয়া সকল অবস্থাতে একই-রূপ কার্য্য করে, তাহা হইলে পশ্বাদির ন্যায় মানবেরও বিবেকের কোনরূপ আবশ্যকতা থাকে না। কিন্তু তাহা যে ঈশ্বরের অভিপ্রেত নহে, তাহা স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে। কারণ যদি পশ্বাদির ন্যায় একইরূপ নিয়মে মানবকে চালিত করা তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি পশ্বাদির ন্যায় মানবহৃদয়েও Instinct দিতেন। অতএব সকল অবস্থায় একরূপ কার্য্য মানবের কর্ত্তব্য নহে। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই সকল অবস্থার উপযোগী ও কর্ত্তব্যদ্বন্দ্বসময়ের করণীয় কর্ত্তব্য ব্যবস্থা নাই। সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মত এই যে, সদা সত্য কহা উচিত ও সর্ব্বদা পরের হিত সাধন করা কর্ত্তব্য; প্রাণান্তেও মিথ্যা বলা বা সত্য কথা গোপন করা উচিত নয় এবং কোন অবস্থাতেই পরের অনিষ্ট করা বা অনিষ্ট হইতে দেওয়া উচিত নয়। কিন্তু যে সময় সত্য কথা বলিতে হইলে পরের অনিষ্ট সংঘটিত হয় বা পরের হিত সাধন করিতে হইলে মিথ্যা বলা আবশ্যক হয় অথবা এক জনের হিতসাধন করিতে গেলে আর এক জনের অনিষ্ট ঘটে, সে সময়ে কি করা কর্ত্তব্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই তাহার বিধান দেখিতে পাওয়া যায় না। কেবল মাত্র হিন্দুশাস্ত্রেই সকল অবস্থার উপযোগী বিধান আছে। হিন্দুশাস্ত্রের মতে কর্ত্তব্যদ্বন্দ্বস্থলে যথাস্ফূর্ত্ত বিবেকের পরামর্শ অনুসারে অথবা মহাজনেরা তাদৃশী অবস্থায় যেরূপ কার্য্য করিয়া থাকেন তাহা

দেখিয়া, কার্য্য করিতে হইবে। মহাভারত হইতে তদ্বিষয়ক দুইটী উদাহরণ নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) কয়েকজন দস্যু কতকগুলি নিরপরাধ পথিকের প্রাণবধের চেষ্টা করিলে, পথিকগণ প্রাণভয়ে নিবিড় বনমধ্যে লুক্কায়িত হইয়াছিল; কোন সত্যবাদী ব্রাহ্মণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। দস্যুগণ ব্রাহ্মণের নিকট তাহাদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করিলে, ব্রাহ্মণ সত্য বলা উচিত বিবেচনায় তাহাদের পলায়নস্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিলেন। দস্যুরা সন্ধান পাইয়া পথিকগণের প্রাণ বধ করিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব হরণ করিল। এই সত্য বাক্য বলায় ব্রাহ্মণের নরকবাস হইয়াছিল।

(২) এক শ্যেনপক্ষী কোন কপোতকে আক্রমণ করিবার উদ্যোগ করিলে, কপোত প্রাণভয়ে শিবি রাজার শরণাপন্ন হইয়াছিল। মহারাজ শিবি তাহাকে ভীত দেখিয়া আপনার সমীপে আশ্রয় প্রদান করিলেন। অবিলম্বে শ্যেন তথায় উপস্থিত হইয়া কহিল, "মহারাজ! আমি ক্ষুধায় কাতর হইয়া কপোত ভক্ষণের উদ্যোগ করিতেছি, আপনি কি জন্য আমার আহারীয় হরণ করিলেন? কপোত আপনার অধিকৃত নহে, উহা আমার খাদ্য, অতএব সত্বর উহাকে পরিত্যাগ করুন। পরস্বাপহরণ করিলে যে মহাপাপ জন্মে, তাহা ত মহারাজের অবিদিত নাই।" শিবি কহিলেন, "কপোত তোমা হইতে ভয় পাইয়া স্বয়ং আসিয়া আমার নিকট আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে, আমি উহাকে হরণ করিয়া আনি নাই; উহার প্রার্থনা অনুসারে উহার হিতের জন্য উহাকে রক্ষা করিয়াছি। সুতরাং আমি পরস্বাপহরণ করি নাই। উহাকে এক্ষণে আমি ত্যাগ করিতে পারি না। কারণ তাহা হইলে তুমি উহার প্রাণ নাশ করিবে। আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করা একান্ত কর্ত্তব্য।" শ্যেন কহিল "মহারাজ! আমি স্বীকার করি আশ্রিতের প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। কিন্তু পরের অনিষ্ট করা কি অকর্ত্তব্য নয়? পরমেশ্বর কপোতদিগকে আমাদের খাদ্যরূপে নির্ণীত করিয়াছেন, উহাদের মাংস ভোজন করিয়া আমরা জীবিত থাকি, সুতরাং আপনি কপোত রক্ষা করিলে যে আমরা আহারাভাবে মরিয়া যাইব। উহাতে কি আপনার পাপ জন্মিবে না? মনীষিগণ বলিয়াছেন "যে ধর্ম্ম ধর্ম্মান্তরের বিরোধী তাহা কখনই ধর্ম্মবাচ্য হইতে পারে না।

অতএব আপনি যখন আমার অনিষ্ট করিয়া কপোতের হিতসাধন করিতেছেন, তখন কখনই উহা কর্ত্তব্য নয়।" মহারাজ ধার্ম্মিকবর শিবি শ্যেনের এবম্বিধ বাক্য শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চিন্তিত হইলেন! তিনি বুঝিলেন যে, পরের হিত সাধন করিবার অধিকার তাঁহার আছে বটে, কিন্তু কাহারও অনিষ্ট করার অধিকার তাঁহার নাই। অতএব কপোতের প্রাণ রক্ষা করিতে হইলে অন্য উপায়ে শ্যেনের ক্ষুধা নিবারণ করা আবশ্যক। ইহা বিবেচনা করিয়া তিনি স্বীয় গাত্র-মাংস দ্বারা শ্যেনের ক্ষুধা নিবারণ করিলেন।

হিন্দু-শাস্ত্রের মধ্যে এইরূপ বহুতর ধর্ম্মতত্ত্বের মীমাংসা আছে; অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই সেরূপ নাই। তাই পাশ্চাত্য ধর্ম্মপরায়ণ যুবকগণ পিতা মাতাকে দুঃখ-সাগরে নিমগ্ন করিয়া ধর্ম্ম সঞ্চয় করিবার যত্ন করেন। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ ধর্ম্মশাস্ত্রের এই হীনতা দেখিয়াই হিতবাদ দর্শনের (Positive philosophy) সৃষ্টি করিয়াছেন। এই সকল বিবেচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যায় যে, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে যে সকল ধর্ম্ম মত প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা সত্য নহে, সুতরাং তাহা শিক্ষা করিলে সত্য জ্ঞান লাভ হয় না। একমাত্র হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রই সত্যদর্শক।

যদিও ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া কিছু কিছু সত্য জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়, কিন্তু তদনুসারে কার্য্য করিতে পারা যায় না। কারণ কার্য্য জ্ঞান দ্বারা সম্পন্ন হয় না, শক্তি দ্বারাই কার্য্য সম্পন্ন করিতে হয়। কিন্তু জ্ঞান লাভ হইলেই ত শক্তি লাভ হয় না; যাহার শক্তি নাই সে মহাজ্ঞানী হইলেও কার্য্য করিতে পারে না। মনে কর, 'দস্যু হস্ত হইতে বন্ধুর প্রাণ রক্ষা করা কর্ত্তব্য' এ জ্ঞান আমার জন্মিল। কিন্তু যদি উপযোগী শক্তি না থাকে তবে কি প্রকারে সে কর্ত্তব্য কার্য্য সাধন কবিব? মনে কর, 'পরদ্রব্য হরণ করা উচিত নয়' এ কথা শিখিলাম। কিন্তু যদি লোভের দমন করিবার শক্তি না থাকে, তবে কি প্রকারে ঐ জ্ঞানানুযায়ী কার্য্য করিব? আমাদের যে সকল ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি আছে, বাহ্য বস্তুর সহিত তাহাদের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। যাহার যাহা ভোগ্য সে বিষয় উপস্থিত হইলেই সেই বৃত্তি তাহাকে প্রবলবেগে আকর্ষণ করে। সে আকর্ষণ নিবারণ করা আবশ্যক হইলে বিপরীত বল প্রয়োগ করিতে হয়। কেবল জ্ঞান বলে তাহা নিবারিত হয় না। পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তি কোন ব্যক্তিকে

পৃথিবীর অভিমুখে আনিবার চেষ্টা করিলে সেই পতন নিবারণ করিবার জন্য যেমন মাধ্যাকর্ষণের বিপরীত বল প্রয়োগ করা আবশ্যক, 'পড়া উচিত নহে, পড়িলে ব্যথা পাইব,' এ জ্ঞানমাত্র যেমন পতন নিবারণ করিতে পারে না, ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তির আকর্ষণ নিবারণ করিতে হইলেও সেইরূপ বিপরীত বল প্রয়োগের আবশ্যক, কেবল জ্ঞানমাত্র তৎসাধনে সমর্থ হয় না। সুতরাং শক্তি লাভের জন্য অনুশীলন আবশ্যক। অর্থাৎ বাল্যকাল হইতে ভোগ্য বিষয়ের অল্পাধিক ব্যবহার দ্বারা বৃত্তি সকলের আবশ্যক মত সঙ্কোচ ও পরিবর্দ্ধন করা আবশ্যক। সুতরাং আহার, বিবাহ ও উপার্জ্জন প্রভৃতি নানা বিষয়ে আমাদের নিয়মিত হওয়া আবশ্যক।

আহারীয় দ্রব্যের সহিত ইন্দ্রিয় ও মনোবৃত্তি সকলের বিলক্ষণ সম্বন্ধ আছে। কেন না আহার দ্বারাই জীবগণের জীবন রক্ষিত হয়। অর্থাৎ জীবগণ যে সকল প্রাকৃতিক শক্তিবলে স্ব স্ব প্রকৃতি অনুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম হয়, আহারীয় দ্রব্য সেই সকল শক্তি পরিবর্দ্ধিত করে। কেবল জীবন রক্ষা জন্য আহার নহে, প্রকৃতি রক্ষা জন্যও আহার আবশ্যক। যে জীবের যেরূপ প্রকৃতি যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে সেই প্রাকৃতিক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় তাহাই সেই জীবের খাদ্য। সিংহ ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু, হিংসাপরিবর্দ্ধক মাংস তাহাদের খাদ্য; ছাগ মেষাদি নিরীহ জন্তু, নিরীহতা পরিবর্দ্ধক উদ্ভিদ্ তাহাদের খাদ্য। ঐরূপ যে দ্রব্য মানবপ্রকৃতির পরিবর্দ্ধক তাহাই মানবের খাদ্য। কেবল শারীরিক বল রক্ষার উপযোগী দ্রব্য আহার করিলে মানবের জীবন রক্ষা হয় না। যাহাতে মানব-জীবনরক্ষিত হয়, এরূপ দ্রব্য আহার করা আবশ্যক। মানবের যে সকল মনোবৃত্তি আছে, তাহার কতকগুলি জীবসাধারণ ও কতকগুলি অনন্যসাধারণ মানবীয়। জীবসাধারণ বৃত্তির কার্য্য মানবের মানবত্বের পরিচারক নহে, জীবত্বেরই পরিচারক। এইজন্য সেগুলি নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি নামে অভিহিত হইয়া থাকে। যে অনন্যসাধারণ বৃত্তিগুলি কেবল মানবেরই আছে, অন্য কোন জীবের নাই, সেই বৃত্তির কার্য্যই মানবত্বের পরিচায়ক। এইজন্য সেই গুলিকে উৎকৃষ্ট প্রবৃত্তি বা মানবীয় বৃত্তি বলে। ঐ সকল উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিচালনেই মানবের মানবত্ব রক্ষিত হয়। এই-জন্য জান্তব জীবন রক্ষা করিবার জন্য যেমন নিকৃষ্ট বৃত্তির পরিবর্দ্ধন

আবশ্যক, মানবজীবন রক্ষার জন্য সেইরূপ উৎকৃষ্ট বৃত্তির পরিবর্দ্ধন আবশ্যক। সুতরাং যে সকল দ্রব্য ভক্ষণে ঐ উভয় প্রকার বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, তাহাই মানবের খাদ্য। কিন্তু জীবন রক্ষার জন্য আবশ্যক বলিয়া জীব-সাধারণ নিকৃষ্ট বৃত্তিগুলি স্বভাবতঃ যেরূপ তেজস্বিনী, মানবীয় বৃত্তিগুলি সেরূপ তেজস্বিনী নহে। অর্থাৎ ক্ষুধা যেমন স্বয়ং উদিত হইয়া ভোজনচেষ্টা করায়, কাম যেমন স্বয়ং উদিত হইয়া দম্পতি সম্ভোগ করায়, লোভ যেমন স্বয়ং উদিত হইয়া অর্জনে প্রবৃত্ত করায়, ভয় যেমন স্বয়ং উদিত হইয়া সাবধান করায়, দয়া, ভক্তি, প্রেম প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তিগুলি সেরূপ তেজে স্বয়ং উদিত হয় না, হইলেও বলবতী নিকৃষ্ট প্রবৃত্তি তাহাদিগকে ঢাকিয়া ফেলে। অতএব যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির শক্তি অযথা বৃদ্ধি প্রাপ্ত না হইতে পারে, প্রত্যুত উৎকৃষ্ট বৃত্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সেই দ্রব্য ভক্ষণ করা আমাদের উচিত—যে দ্রব্য ভক্ষণ করিলে নিকৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট উভয় প্রকার বৃত্তিই ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিবার উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হইতে পারে, তাহাই আমাদের খাদ্য। সেইরূপ দ্রব্য ভক্ষণ করিলেই মানবজীবন রক্ষা হয়। অতএব ধর্ম্মশাস্ত্রে বৈধ আহারীয় দ্রব্য ও তাহার পরিমাণাদির বিষয় নির্ণীত থাকা একান্ত আবশ্যক। কিন্তু কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই আহার সম্বন্ধীয় কোন বিধি দৃষ্ট হয় না। প্রত্যুত সে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে আহারীয় দ্রব্যের সহিতে ধর্ম্মের কোন সম্বন্ধ নাই। খৃষ্ট বলিয়াছেন "মুখের ভিতর যাহা ইচ্ছা দিতে পার, কিন্তু যাহা মুখ হইতে বাহির করিবে তাহা যেন মন্দ না হয়।" আশ্চর্য্য এই যে, যাহা মুখের ভিতর যায় তাহাই যে রূপান্তরিত হইয়া বাহিরে আইসে, এ কথা তিনি বিবেচনা করেন নাই। হিন্দুশাস্ত্রে মানবীয় আহারপ্রণালীর বিষয় সুন্দর-রূপে আলোচিত হইয়াছে। ভগবান বাসুদেব বলিতেছেন—

আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্যসুখপ্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃস্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়াঃ॥
কট্বম্ললবণাত্যুষ্ণতীক্ষ্ণরুক্ষবিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥
যাতয়ামং গতরসং পূতি পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ং॥

সাত্ত্বিক আহারই মানবত্ব সম্পাদন করে, রাজসিক ও তামসিক আহার পশু প্রকৃতি সম্পাদক।

বিবাহ বিষয়েও সাত্ত্বিক হওয়া আবশ্যক। অর্থাৎ সম্ভোগবাসনায় স্ত্রীপুরুষের মিলন কর্ত্তব্য নয়। সৃষ্টি রক্ষাই কাম বৃত্তি চরিতার্থ করার মুখ্য উদ্দেশ্য। "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রঃ পিণ্ডপ্রয়োজনঃ"। (পিণ্ড শব্দের অর্থ যদি পাঠক হৃদয়ঙ্গম না করিতে পারেন, তবে অন্ততঃ 'সৃষ্টি রক্ষা' এই অর্থটী বুঝিয়া লইবেন।) অতএব যেরূপে স্ত্রী পুরুষের সম্মিলন হইলে সম্ভোগ বাসনা বলবতী না হইয়া জনিষ্যমান পুত্রের মঙ্গল বিহিত হয়, সেইরূপে দাম্পত্য ব্যবহার করা মানবের কর্ত্তব্য। সম্ভোগসুখের উদ্দেশে যে বিবাহ তাহা পাশব বিবাহ। সেরূপ বিবাহে জান্তব বৃত্তিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, সুতরাং বিবাহ বিষয়ে নিয়মিত হওয়া আবশ্যক। কিন্তু অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই বিবাহ বিষয়ে কোন বিধি নাই। সেই জন্য তৎপরায়ণগণ সুখভোগ উদ্দেশে পাশব বিবাহ করেন। তাই যে রমণী তাঁহাদের মনোনীত না হয় অর্থাৎ যাহাকে উপভোগের সম্যক্ উপযোগী বলিয়া বোধ না হয়, তাহাকে তাঁহারা তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন ও যেরূপে রমণীসহবাস করিলে পশুপ্রকৃতিসুলভ সুখ সম্পাদিত হয়, নিয়ত তাহারই চেষ্টা করেন। কি করিলে জনিষ্যমাণ সন্তান গুণবান্ হইবে, বা কি করিলে রিপুর অধীন না হইতে হয়, সে দিকে কাহারই দৃষ্টি নাই।

মানবত্ব সম্পাদনের উপযোগী বিবাহ ব্যবস্থা এক মাত্র হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রেই আছে। হিন্দুশাস্ত্রের বিবাহপ্রণালী ও দম্পতীসহবাসের নিয়মগুলি সমস্তই সন্তানের হিতসাধন ও মানবত্ব রক্ষার উপযোগী। রিপুচরিতার্থজনিত সুখসাধন সে বিবাহের উদ্দেশ্য নয়। হিন্দুশাস্ত্রের মতে পাত্র কন্যার রূপ দেখিতে হইবে বটে, কিন্তু তাহা উপভোগের অনুকূলতা জন্য নহে, সন্তানের মানবোচিত রূপ আবশ্যক, তজ্জন্য মাত্র। সেইজন্য সে রূপ পাত্র কন্যার নির্ব্বাচনসাপেক্ষ নহে, বিজ্ঞ পিতা মাতা প্রভৃতিই তাহার উপযোগিতা দেখিবেন। সন্তান পিতা মাতার দোষ গুণ অধিকার করে, এইজন্য যাহাতে পিতা মাতা ধার্ম্মিক, বুদ্ধিমান, স্বাস্থ্যসম্পন্ন, রূপবান্, সদ্বংশজাত, দীর্ঘায়ু ও উপযোগী শক্তিসম্পন্ন হয় শাস্ত্রকারগণ তাহারই উপায় বিধান করিয়াছেন। পাছে যুবক যুবতী পশুস্বভাবসুলভ রূপমদে

আকৃষ্ট হইয়া দোষাকর বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়, এই ভয়ে হিন্দুশাস্ত্রকারগণ পতিপত্নীর প্রতি দয়িত নির্ব্বাচনের অধিকার দেন নাই। নির্ব্বাচনপ্রথার মূলই দোষাবহ। কারণ তাহাতে প্রথম হইতেই নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির পরিচালনা ও সম্ভোগেচ্ছা বলবতী হইতে থাকে।

অন্য ধর্ম্ম শাস্ত্রাবলম্বিগণের বিবাহ সম্বন্ধীয় সকল অনুষ্ঠানই নিকৃষ্টবৃত্তি ও সম্ভোগ স্পৃহার পরিবর্দ্ধক। হিন্দুশাস্ত্রের মতানুযায়ী বিবাহ সম্বন্ধীয় কোন অনুষ্ঠানই নিকৃষ্ট বৃত্তির কিঞ্চিন্মাত্র উত্তেজক নহে, প্রত্যুত হিন্দুর বিবাহ অতি পবিত্র দৈব সংস্কার বিশেষ। পিতা মাতা ও আত্মীয়গণ, উপযোগী পাত্র পাত্রী নির্ব্বাচন করিয়া এমন পবিত্র ভাবে বিবাহক্রিয়া সম্পাদন করেন, যে সে সময়ে কাহারই মনোমধ্যে অশ্লীল ভাবের বা নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির কিছুমাত্র উদ্রেক হয় না, প্রত্যুত সকলেরই হৃদয় ধর্ম্ম ভাবে পরিপূর্ণ হয়। কারণ সন্তান লাভই যে বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য, ইহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য বিবাহ দিনে পিত্রাদির শ্রাদ্ধ করিতে হয়, ঈশ্বরাভিপ্রেত সম্পাদন জন্যই যে বিবাহ আবশ্যক আপনার সুখের জন্য নহে, ইহা বুঝাইয়া দিবার জন্য দেবতাদির পূজা করিতে হয়, এবং দম্পতীর পরস্পরের ভোগসুখ বৃদ্ধি করা কর্ত্তব্য নহে, ফলতঃ স্ত্রীপুরুষ উভয়ে মিলিত হইয়া একপ্রাণে জগতের হিত সাধন করিতে হইবে, ইহা স্মরণ করিয়া দিবার জন্য দরিদ্রদিগকে ধন দান ও আত্মীয় এবং প্রতিবেশিগণকে ভোজনাদি দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে হয়। এই প্রকারে হিন্দুর বিবাহ ব্যাপার বৃহৎ যজ্ঞ বিশেষে পরিণত হয়। ঐ যজ্ঞের ফলে যুবক যুবতী সহজাতের ন্যায় মিলিত হইয়া হিতকর কার্য্যাদি দ্বারা বর্ত্তমান কালের এবং সুসন্তানজন্মদানদ্বারা ভবিষ্যৎকালের হিতসাধন করে। বিবাহিত হইয়া স্ত্রীপুরুষ যথেচ্ছ সম্ভোগে রত হইয়া নিকৃষ্ট বৃত্তি পরিবর্দ্ধিত করিতে না পারে, তদুপযোগী বহুতর নিয়মও হিন্দুশাস্ত্রমধ্যে আছে। সে সকলের পালন করিয়া মানব জিতেন্দ্রিয় ও সুসন্তান জন্মদানে সক্ষম হয় এবং কামকে বিবেকের অধীন করিয়া পুত্রজননকার্য্য সম্পন্ন করে। মনু বলিয়াছেন—

অনিন্দিতৈঃ স্ত্রীবিবাহৈরনিন্দ্যা ভবতি প্রজা।
নিন্দিতৈর্নিন্দিতা নৃণাং তস্মান্নিন্দ্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
ব্রাহ্মাদিষু বিবাহেষু চতুর্ষ্বেবানুপূর্ব্বশঃ।

ব্রহ্মবর্চ্চস্বিনঃ পুত্রা জায়ন্তে শিষ্টসম্মতাঃ ॥
রূপসত্ত্বগুণোপেতা ধনবন্তো যশস্বিনঃ।
পর্য্যাপ্তভোগা ধর্ম্মিষ্ঠা জীবন্তি চ শতঃ সমাঃ ॥
ইতরেষু তু শিষ্টেষু নৃশংসানৃতবাদিনঃ।
জায়ন্তে দুর্বিবাহেষু ব্রহ্মধর্ম্মদ্বিষঃ সুতাঃ ॥
ঋতুকালাভিগামী স্যাৎ স্বদারনিরতঃ সদা।
পর্ব্ববর্জ্জং ব্রজেচ্চৈনাং তদ্ব্রতো রতিকাম্যয়া ॥

বাস্তবিক পিতা মাতা যদি বিবাহসম্বন্ধীয় ব্যাপারে সুনিয়মিত না হয়েন, তাহা হইলে পরে শত প্রকার চেষ্টা করিয়াও পুত্রের মঙ্গল বিধান করিতে পারেন না; কিন্তু যদি সুপুত্র জননোপযোগী কার্য্য সকল সুনিয়মে নির্ব্বাহিত করিতে পারেন, তাহা হইতে অল্প আয়াসেই পুত্র গুণসম্পন্ন ও জ্ঞানী হয়। কেন না স্বভাব সর্ব্বোপরি প্রবল, স্বভাবের পরিবর্ত্তন করা বড় সহজ নহে। যাহার স্বভাব ভাল সে অল্প আয়াসে ভাল হয়, যাহার স্বভাব মন্দ তাহাকে ভাল করা অতিশয় দুরূহ। সেই স্বভাব জন্ম ক্রিয়ার উপরেই অধিক নির্ভর নহে। পিতামাতা যদি অনুশীলনপরায়ণ, সৎস্বভাব ও ধার্ম্মিক হয়েন এবং তাঁহারা যদি ধর্ম্মভাবে পুত্রোৎপাদন করেন, তাহা হইলে সে পুত্রের স্বভাব ও বুদ্ধি প্রভৃতি উত্তম হয়; অন্যথাচরণে পুত্রের স্বভাবাদি অত্যন্ত মন্দ হইয়া পড়ে। সুতরাং বিবাহের সুব্যবস্থাই মানবের উন্নতির সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায়। এইজন্য বিবাহরূপ অনুশীলন মানবের শ্রেষ্ঠ অনুশীলন—বিবাহ-সংস্কার সর্ব্বপ্রধান সংস্কার। এই অনুশীলনে নিজের ও পুত্রের উভয়েরই হিত সাধিত হয়।

উপার্জ্জন ও ব্যয় বিষয়েও আমাদের সুনিয়মিত হওয়া একান্ত আবশ্যক। কারণ উপার্জ্জন ও ব্যয় বিষয়ে সুনিয়মিত না হইলে লোভ অতিশয় প্রবল হয়, ও সেই প্রবল লোভের প্ররোচনায় মানব নানাপ্রকার অসৎ কার্য্যে রত হয়। দস্যুতা, পরস্বাপহরণ, যুদ্ধ, বিগ্রহ, প্রতারণা প্রভৃতি নানা প্রকার অকার্য্য লোভ হইতে জন্মে। লোভের পরবশ হইয়া নিয়ত উপার্জ্জনকার্য্যে ব্যস্ত থাকিলে মানব পিশাচপ্রকৃতি প্রাপ্ত হয়। উপার্জ্জন করিয়া কাহারও আশা মিটে না। কোটি কোটি স্বর্ণমুদ্রার অধিপতি হইলেও কাহারও উপার্জ্জন স্পৃহার হ্রাস হয় না। সুতরাং কেহই শান্তির সুশীতল ক্রোড়ে স্থান

লাভ করিতে পারে না। বিশেষতঃ উপার্জ্জন বিষয়ে সুনিয়মিত না হইলে কেহ পর্ব্বতপ্রমাণ ধনের অধিপতি হইয়া নানাপ্রকার কুকার্য্যে রত হয় ও কেহ নিতান্ত আবশ্যক অন্নের অভাবে মৃতপ্রায় হয়; কেহ ভিন্ন ভিন্ন দেশবাসী শত শত লোকের শোণিত পান করিয়া স্থূলকায় হয় ও কত কত জাতি পরাধীনতাজনিত দুঃখে ম্রিয়মাণ হয়; কেহ ভোগবিলাসে উন্মত্ত হয়, ও কেহ শীতবাতাদিতে ক্লান্ত ও পীড়িত হয়। অধিক কি, আমাদের বোধ হয়, মানবের সকল প্রকার দুঃখই উপার্জনবিষয়ক অনিয়ম হইতে উৎপন্ন। কিছুকাল পূর্ব্ববর্ত্তী এতদ্দেশীয় লোকদিগের সহিত এক্ষণকার লোকদিগের তুলনা করিলেই এ বিষয় স্পষ্ট বুঝা যাইতে পারে। পূর্ব্বে প্রায় সকলেই প্রসন্নচিত্তে সুখস্বচ্ছন্দে বাস করিত, প্রায় কেহই দারিদ্র্য দুঃখে একান্ত নিপীড়িত হইত না। ভারতের কোন ব্যক্তিই মহাসমৃদ্ধি সম্পন্ন ইংলণ্ডের নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যগণের ন্যায় দরিদ্র ও পিশাচপ্রকৃতি ছিল না। নিতান্ত দরিদ্র ব্যক্তিও দানাদি মানবীয় কার্য্য, ঈশ্বরসেবা ও সদাচারপরায়ণ হইয়া মানবজন্ম সার্থক করিত। (অদ্যাপি নিম্নশ্রেণীর ইংলণ্ডবাসী অপেক্ষা ভারতীয় নিম্নশ্রেণীর মনুষ্যগণ অনেক উন্নত।) কিন্তু এক্ষণে সকল ব্যক্তিই নিয়ত দুঃখে ম্রিয়মাণ। কি ধনবান্, কি দরিদ্র সকলেই দিবা নিশি উপার্জ্জনচিন্তায় মগ্ন; অন্য কোন মানবীয় বৃত্তি বিকসিত করিবার অবসর কাহারই নাই। ইতর, ভদ্র, বুদ্ধিমান, নির্ব্বোধ সকলেই কেবল উপার্জ্জন জন্য ব্যস্ত। চাক্‌রীই সকলের প্রধান লক্ষ্য হইয়াছে। সেই চাক্‌রী পাইবার উপযোগী বিদ্যা শিক্ষা করিতে আপামর সাধারণ সকলেই নিযুক্ত। সকলেই যথাসম্ভব তদুপযোগী শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া চাকুরী লাভের জন্য নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া নানা ব্যক্তির উপাসনা করিতেছেন। যিনি তল্লাভে কৃতকার্য্য হয়েন, তিনি আপনাকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করেন। যিনি চাক্‌রী লাভে কৃতকার্য্য না হয়েন, তিনি কোন ব্যবসায় কার্য্য, পুস্তক প্রণয়ন বা সংবাদপত্রসম্পাদন কার্য্য অবলম্বন করিয়া দিবারাত্রি গ্রাহক জুটাইবার জন্য লোকের দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করেন। কিন্তু আবশ্যক মূলধনের অল্পতা ও ব্যবসায়বুদ্ধির অভাব প্রযুক্ত অনেকেরই সে সকল চেষ্টা সফল হয় না। তখন হয় তাঁহারা অবলম্বিত ব্যবসায়ের প্রতি দোষার্পণ করিয়া অন্য ব্যবসায়ের অনুসন্ধান

করেন, অথবা প্রতারণাকৌশল অবলম্বন করিয়া তৎসাধনের চেষ্টা করেন। এই প্রকারে কেবল উপার্জনকৌশল ভাবিতে ভাবিতে আধুনিক জনগণের জীবন অতিবাহিত হয়। অদ্ভুত প্রতারণাপূর্ণ বিজ্ঞাপনকৌশল অবলম্বনে পরস্বাপহরণ করাই এক্ষণকার অনেকের জীবনবৃত্তি হইয়াছে। বিজ্ঞাপন অতি ভয়ানক অস্ত্রজড়িত জালবিশেষ। ঐ জালে না পড়েন এমন লোকই দেখা যায় না। আত্মপ্রশংসা উহার প্রাণ, প্রতারণা উহার আত্মা, এবং স্বার্থপরতা উহার দেহ। নিষ্কাম পরোপকাররূপ পরিচ্ছদে সকল দেহ আবৃত থাকায় উহার অভ্যন্তরস্থ প্রাণ ভিন্ন আর কিছুই পরিলক্ষিত হয় না, সুতরাং পয়োমুখ বিষকুম্ভ অপেক্ষাও বিজ্ঞাপন ভয়ানক।

এই সকল অসৎ উপায় চিন্তা করিতে করিতে মানব এমন অপদার্থ হইয়া পড়ে যে, সঞ্চিত ধনের উপযুক্ত ব্যয় সাধনেও সক্ষম হয় না। সকলকে প্রতারণা করিয়া যে ধন উপার্জিত হইল, এত যত্নসঞ্চিত সেই ধন কি পরের জন্য ব্যয় করা যায়? আর করিলেও গরু কেটে জুতা দান করা হয়। সুতরাং অতিথি সেবা দূরে থাকুক, কেহ ভিক্ষুককেও এক মুষ্টি চাউল দেন না; আত্মীয়বন্ধুর হিত সাধন করা দূরে থাকুক, পিতা মাতারও সৎকার করেন না। কেবল আপনার ও প্রিয় পত্নীর ভোজন, পরিচ্ছদালঙ্কার ও ভোগ-সুখের উপযোগী বিষয়েই অর্থ ব্যয় করেন। এইরূপে আজিকালিকার যুবক-জীবন অধমাধম পশুজীবন অপেক্ষাও অধম হইয়া পড়িয়াছে। উপার্জ্জন বিষয়ে নিয়মিত না হওয়াই ইহার মূল কারণ। অতএব উপার্জ্জন ও ব্যয় সম্বন্ধে অনুশীলনপরায়ণ হওয়া নিতান্ত আবশ্যক। কিন্তু হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই তদ্বিষয়ক কোনরূপ অনুশীলনবিধি নাই।

হিন্দুশাস্ত্রে উপার্জ্জন সম্বন্ধে অতি উৎকৃষ্ট পদ্ধতি বিধিবদ্ধ আছে। সেই উৎকৃষ্ট বিধির অনুশীলন করিলে নিষ্কাম ভাবে উপার্জ্জন করিয়া আপনার ও জগতের হিতসাধন করিতে পারা যায়। হিন্দুধর্ম্মের উপার্জ্জন সম্বন্ধীয় মূল ব্যবস্থা এই যে, আপদ্‌কাল ভিন্ন সকল সময়েই সকলকে পৈতৃক বৃত্তি অবলম্বন করিয়া উপার্জ্জন করিতে হইবে। শিশু পিতামাতার প্রকৃতি প্রাপ্ত হইয়া স্বভাবতঃই পিত্র্যবলম্বিত কার্য্য করিবার উপযোগী শক্তি সম্পন্ন হয়, বাল্যকাল হইতে অনায়াসে পিতামাতার নিকট হইতে তদ্বিষয়ের শিক্ষা লাভ করিতে পারে এবং নিয়ত পিতা মাতা ও আত্মীয় স্বজনকে সেই

কার্য্য করিতে দেখিয়া অল্প আয়াসেই সেই কার্য্যে পটুতা লাভ করে, সুতরাং উপার্জ্জনশক্তি লাভের জন্য এক্ষণকার ন্যায় রাত্রিজাগরণাদি দ্বারা শারীরিক এবং পরের উপাসনা প্রভৃতি দ্বারা মানসিক স্বাস্থ্য ভঙ্গ করিতে হয় না, কোন প্রকার প্রতারণাকৌশল ভাবিয়াও মানবত্ব হারাইতে হয় না। প্রত্যুত সকলেই কর্ত্তব্যবোধে বাল্যকাল হইতে এক মনে নিপুণতা সহকারে পিত্র্যবলম্বিত কার্য্য অবলম্বনে উপার্জন কার্য্য সম্পন্ন করিয়া অবশিষ্ট সময়ে অন্যান্য বৃত্তির উপযোগী কার্য্য করিতে পারে। এইরূপে অল্পায়াসে অর্থ উপার্জ্জিত হওয়ায় কাহারও ধনের প্রতি তাদৃশী মমতা জন্মে না, সুতরাং অতিথিসেবা, দরিদ্রদিগকে দান এবং পিতামাতা ও আত্মীয়গণের পরিচর্য্যা প্রভৃতি কার্য্যে আবশ্যক মত ব্যয় করিয়া, কর্ত্তব্য সম্পাদন ও মানবত্ব রক্ষারূপ সুখ লাভ করিতে সমর্থ হয়। কোন ব্যক্তিই কাহারও বৃত্তিনাশ করে না, সুতরাং উপার্জ্জন অভাবে কেহই কষ্ট পায় না। প্রত্যুত সকল ব্যক্তিই আবশ্যক মত উপার্জন করিয়া তদ্দ্বারা প্রয়োজনীয় কার্য্য সম্পাদন এবং দয়া, ভক্তি ও কৃতজ্ঞতা প্রভৃতি মানবীয় বৃত্তি সকলের ঔৎকর্ষ সাধন করিতে পারে। কি দরিদ্র, কি ধনী, কি পণ্ডিত, কি মূর্খ, কি বলবান্, কি দুর্ব্বল সকলেই আবশ্যকমত ঈশ্বরদত্ত বৃত্তি সকলের পরিচালনা করিয়া মানবনাম সার্থক করিতে পারে। স্তূপাকার ধনের অধিপতি বা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হইলেই মানব উন্নতির পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না। মানবত্বের উন্নতিই প্রকৃত উন্নতি। ন্যায়ানুসারে পরিমিত উপার্জন করিয়া তদ্দ্বারা জগতের হিত ও সুপুত্রের জন্মদানদ্বারা জগতের উন্নতি সাধনরূপ ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া ব্রহ্মানন্দ লাভ করাই আমাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। উহাই প্রকৃত মানবত্ব। ভগবান্ মনু বলিতেছেন—

ন লোকবৃত্তং বর্ত্তেত বৃত্তিহেতোঃ কথঞ্চন।
অজিহ্মামশঠাং শুদ্ধাং জীবেদ্ ব্রাহ্মণজীবিকাং॥
সন্তোষং পরমাস্থায় সুখার্থী সংযতো ভবেৎ।
সন্তোষমূলং হি সুখং দুঃখমূলং বিপর্য্যয়ঃ॥

এই প্রকারে আলোচনা করিয়া দেখিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, আমাদের বৃত্তি সকলকে বিবেকাধীন করিবার জন্য নানা প্রকার অনুশীলন

আবশ্যক। অনুশীলন দ্বারাই পিতা, মাতা, গুরু ও অন্যান্য গুরুজনের সেবা, পুত্র কন্যা ও আশ্রিতবর্গের প্রতিপালন, আত্মীয়, বন্ধু, প্রতিবেশী, স্বজাতি ও ইতর প্রাণিগণের প্রতি প্রেম, এবং অতিথি, ভিক্ষুক ও বিপন্নের প্রতি দয়া করিবার উপযোগী শক্তি লাভ করিতে হয়। অনুশীলন দ্বারাই উৎকৃষ্ট মনোবৃত্তি সকলের পরিবর্দ্ধন ও নিকৃষ্ট প্রবৃত্তির দমন করিতে হয়। অনুশীলনের নামান্তর আচার। তাই আচার হিন্দুধর্ম্মের একটী প্রধান অঙ্গ। মনু বলিতেছেন—

দেবতাতিথিভৃত্যানাং পিতৄনামাত্মনশ্চ যঃ।
ন নির্বপতি পঞ্চানামুচ্ছ্বসন্ন স জীবতি॥
ভুক্তবৎস্বথ বিপ্রেষু স্বেষু ভৃত্যেষু চৈব হি।
ভুঞ্জীয়াতাং ততঃ পশ্চাদবশিষ্টন্তু দম্পতী॥
দেবানৃষীন্মনুষ্যাংশ্চ পিতৄন্ গৃহ্যাশ্চ দেবতাঃ।
পূজয়িত্বা ততঃ পশ্চাদ্গৃহস্থঃ শেষভুগ্ ভবেৎ॥
অঘং স কেবলং ভুঙ্‌ক্তে যঃ পচত্যাত্মকারণাৎ। ইত্যাদি

প্রবন্ধের বিস্তৃতি ভয়ে অধিক উদ্ধৃত হইল না। ফলতঃ মানবত্ব লাভ করিবার জন্য যে সকল বিষয়ের আলোচনা ও যেরূপ আচার বা অনুশীলন সম্পন্ন হওয়া আবশ্যক, তৎ সমস্তই হিন্দুশাস্ত্রের মধ্যে আছে। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরোপাসনার অনুশীলন ভিন্ন আর কোন প্রকার অনুশীলন বা আচারপদ্ধতি নাই।

অন্যান্য শাস্ত্রের উপাসনাপদ্ধতিও সম্যক্ ফলোপধায়িনী নহে। কেন না তদুল্লিখিত রূপে উপাসনা করিলে ঈশ্বরের প্রতি বাস্তবিক ভক্তি জন্মে না, প্রত্যুত তদ্দ্বারা পশুবৃত্তিই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়—ভয় ও লোভেরই বৃদ্ধি হয়। পরমেশ্বরের আরাধনা না করিলে ইহকালে ও পরকালে অশেষ যাতনা পাইতে হইবে, এই ভয় এবং তদীয় উপাসনা করিলে ইহকালের ও পরকালের মঙ্গলসাধিত হইবে, এই লোভের পরতন্ত্র হইয়াই ঐ সকল ধর্ম্মাবলম্বিগণ ঈশ্বরের উপাসনা করেন। সুতরাং ঐরূপ উপাসনায় ভয় ও লোভের অধিক পরিচালনা হয় ও তজ্জন্য অন্যান্য বৃত্তিগুলি খর্ব্ব হইয়া যায়। সুতরাং কোন বৃত্তিই বিবেকের অধীন হয় না। বিশেষতঃ তাঁহাদের উপাসনা কেবল কতকগুলি প্রার্থনাবাক্য মাত্র। হৃদয়কে ঈশ্বরে আকৃষ্ট করিবার

উপযোগী কোন অনুষ্ঠানই তাঁহাদের উপাসনাপ্রণালী মধ্যে নাই, সুতরাং সেরূপ উপাসনায় উৎকৃষ্ট বৃত্তির সম্যক্ পরিবর্দ্ধন হয় না। হিন্দুর উপাসনা-পদ্ধতি সেরূপ নহে। হিন্দু নিষ্কাম হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন। যাহাতে মানবীয় শক্তি পরিবর্দ্ধিত হয়, যাহাতে আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব পরিজ্ঞাত হওয়া যায়, তাহারই উপায় বিধান জন্য হিন্দু ঈশ্বরের উপাসনা করেন, ভয়ের পর-তন্ত্র বা কামনাপরায়ণ হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করেন না। হিন্দুরও কাম্য উপাসনা আছে বটে, অর্থাৎ দুর্গাদির পূজা করিয়া 'ধনং দেহি যশো দেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহি মে' ইত্যাদি রূপ প্রার্থনা হিন্দু করেন বটে, কিন্তু সে উপাসনাপ্রণালী জ্ঞানিগণের জন্য নহে। (পরে আমরা এ বিষয়ের আলোচনা করিব।) জ্ঞানিগণের উপাসনা সম্পূর্ণ নিষ্কাম। ঈশ্বরাভিপ্রেত সাধন শক্তি লাভ ভিন্ন অন্য কোন প্রকার ফলাকাঙ্ক্ষা তাঁহাদের নাই।

হিন্দুর উপাসনা পদ্ধতিও অতি চমৎকার। প্রত্যুষে উঠিয়া অবধি নিদ্রিত হইবার সময় পর্য্যন্ত যে সকল কার্য্য করিতে হইবে, তৎসমস্ত কার্য্যেরই আরম্ভে ঈশ্বরের স্মরণ করিতে হইবে। সুতরাং ঈশ্বরের কথা ও কর্ত্তব্যের কথা সর্ব্বদাই আমাদের স্মরণপথে বর্ত্তমান থাকে। নির্জ্জনে নিবিষ্ট চিত্তে হৃদয়াকর্ষক নানাবিধ উপকরণ সংযোগে যেরূপে ঈশ্বরের ধ্যান করিতে হয়, সেই ধ্যানের সময় মানব বাহ্যজ্ঞান শূন্য ও আত্মহারা হইয়া এককালে ঈশ্বরে সংলগ্ন হয়। সেই ভক্তিযোগ সময়ে মানব যে অনির্ব্বচনীয় সুখলাভ করে তাহার নিকট অন্য সকল সুখই তুচ্ছ বোধ হয়। সুতরাং সকল মনোবৃত্তিই ঈশ্বরমুখী হইয়া ঈশ্বরকার্য্যসাধনে তৎপর হয়। খৃষ্টের উপাসনা ভিন্ন মানবের উদ্ধারের উপায় নাই ভাবিয়া যেমন উদ্ধারের আশায় খৃষ্টানেরা খৃষ্টের শরণাপন্ন হয়েন, হিন্দুর সেরূপ ভাবনা নাই। হিন্দুর উপাসনা আপনার উদ্ধার বা কোন প্রকার স্বার্থ সাধন জন্য নহে। আমাদের দ্বারা উপাসিত হইয়া সুখলাভ করিবেন এই অভিপ্রায়ে ঈশ্বর ত আমাদের সৃষ্টি করেন নাই। সুতরাং যে তাঁহার উপাসনা করে তাহার প্রতি তুষ্ট ও যে উপাসনা না করে তাহার প্রতি রুষ্ট হয়েন না। জ্ঞান ও অনুশীলন সম্পন্ন হইয়া তাঁহার কার্য্যসাধন করিবার উপযোগী হইবার জন্যই তাঁহার উপাসনা করিতে হয়। সুতরাং হরি বলা ভাল কি কাল্ বলা ভাল, সে বিষয়ে কোন--রূপ চিন্তার প্রয়োজন নাই। ভক্তিভাবে ঈশ্বরজ্ঞানে যে নাম ইচ্ছা সেই

নামে তাঁহাকে ডাকিলেই হইতে পারে। এমন কি, ঈশ্বরজ্ঞানে বৃক্ষ, নদী বা পর্ব্বতাদির উপাসনা করিলেও আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। ঈশ্বরের স্বরূপ আমাদের নিতান্ত অজ্ঞেয়, এই জন্য তত্ত্বপরায়ণগণ ভক্তি প্রেমের উপ-যোগী তাঁহার নানাপ্রকার মূর্ত্তি কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত উদ্দেশ্য জ্ঞান থাকিলে তাহার যে কোন মূর্ত্তির উপাসনা করিলেই আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়। কিন্তু পিত্র্যবলম্বিত ঈশ্বরমূর্ত্তির উপাসনা ভিন্ন ফল লাভের তাদৃশী সম্ভাবনা নাই বলিয়া পৈতৃক ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত। কারণ পিতামাতা যে মূর্ত্তির উপাসনা করেন, বাল্য কাল হইতে সেই মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিতে করিতে তৎপ্রতি যেরূপ ভক্তি জন্মিতে পারে, কোন্ মূর্ত্তি ভাল এরূপ বিচার করিয়া উপাসনা করিতে হইলে সেরূপ ভক্তি জন্মে না। এই জন্য হিন্দুশাস্ত্রের মতে পিত্র্যবলম্বিত ঈশ্বরমূর্ত্তির আরাধনা করা কর্ত্তব্য। এরূপ সত্য উদার ভাব আর কোন ধর্ম্মশাস্ত্রেই নাই। অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্র-প্রণেতাগণ ঈশ্বরের যে নাম ও যে লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন, তাঁহাদের মতে সেইরূপ ঈশ্বরের আরাধনা ভিন্ন মানবের উদ্ধারের উপায় নাই। সুতরাং সে সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে ঈশ্বর সেই ধর্ম্ম-পরায়ণ কয়েক জন লোক ভিন্ন আর কাহারই উদ্ধারসাধন করেন না। এ কথা নিতান্ত যুক্তিহীন। কেননা ঈশ্বর ব্যক্তি বা সম্প্রদায় বিশেষের নহেন, তিনি সকলেরই। ফলতঃ হিন্দুশাস্ত্রের উপাসনাপ্রণালী যেরূপ মানবকে কর্ত্তব্যপরায়ণ করিবার উপযোগী, অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের উপাসনাপ্রণালী সেরূপ নহে। তত্তৎ শাস্ত্রের উপাসনা কেবল ঈশ্বরকে তুষ্ট করিয়া ঈপ্সিত ফল লাভের জন্য, সুতরাং তাহা অনুশীলনবিশেষ নহে।

অন্যান্য ধর্ম্মশাস্ত্রের আর একটি মহৎ দোষ এই যে, তৎসমস্তের বিধানের সহিত জ্ঞানের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। সুতরাং যে সকল ব্যক্তি সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে চলে, তাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞানোন্নতি হইতে পারে না। জ্ঞানোন্নত ব্যক্তিগণ সেই সকল ধর্ম্মশাস্ত্র অবলম্বনে চলিতে পারে না। মূর্খগণ অন্ধ বিশ্বাস ভরেই তদনুসারে চলিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের মত এই যে জগৎ ছয় সহস্র বৎসর মাত্র সৃষ্ট হইয়াছে, এবং যখন ঈশ্বর জগৎ সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তখন কোন দিন 'জল হউক' কোন দিন 'বায়ু হউক' এইরূপে ছয় দিনে ছয়টী বাক্য উচ্চারণ করিয়া সৃষ্টিকার্য্য সম্পাদন করিয়া

নিতান্ত শ্রান্ত হইয়া রবিবারে বিশ্রাম করিয়াছিলেন। জ্ঞানী ব্যক্তি কি এ কথা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারেন? কখনই না। কারণ যিনি অনন্তকাল বিরাজমান, তিনি ছয় সহস্র বৎসর মাত্র কার্য্য আরম্ভ করিয়াছেন, আর অনন্তকাল কর্ম্মশূন্য ও প্রকাশহীন হইয়াছিলেন, কল্পনাও এরূপ নির্দ্দেশ করিতে পারে না। যাঁহার শক্তির অন্ত নাই, তিনি ছয় দিনে ছয়টী বাক্যমাত্র উচ্চারণ করিয়া শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন, এ কথা মূর্খেরও বিশ্বাসযোগ্য নহে। ঐ ধর্ম্মশাস্ত্রের মতে পরমেশ্বর পিতা ঈশ্বর,পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা এই তিন ভাগে বিভক্ত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, ঐ তিন মূর্ত্তির কার্য্যের কিছুমাত্র সামঞ্জস্য নাই। প্রত্যুত এক মূর্ত্তি আর এক মূর্ত্তির কার্য্যের সম্পূর্ণ বাধা প্রদান করেন। কেন না মনুষ্যকৃত পাপ পুণ্যের বিচার করিয়া অনুরূপ দণ্ড ও পুরস্কার প্রদান করা, পিতা ঈশ্বরের কার্য্য। কিন্তু পুত্র ঈশ্বর বা খৃষ্ট সে সুবিচারের বাধা প্রদান করেন। কারণ শত শত মহাপাপ করিয়াও যদি কেহ খৃষ্টের শরণাপন্ন হয়, খৃষ্ট তাহার সমস্ত পাপ মোচন করেন। সুতরাং পিতা ঈশ্বর তাহার প্রতি দণ্ড বিধান করিতে সমর্থ হয়েন না। এবং যে ব্যক্তি চিরজীবন সৎকার্য্য সম্পাদন ও পিতা ঈশ্বরের আরাধনা করে, সে যদি খৃষ্টের শরণাপন্ন না হয়, তবে পিতা ঈশ্বর তাহার উদ্ধার সাধন করিতে পারেন না; সে অনন্তকাল কষ্ট পায়। এইরূপ যুক্তি-বিরুদ্ধ ও জ্ঞানীর অবোধ্য বিষয়ে খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ। জ্ঞানপিপাসা তিরোহিত হইতে পারে, এমন কোন বিষয়ই ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রে নাই। কোন প্রকার তর্ক, যুক্তি ও আবশ্যক কোন প্রকার জ্ঞাতব্যই সে সকলের মধ্যে নাই। কেবল ঈশ্বরের কাল্পনিক স্বরূপ, কাল্পনিক উপাসনাপদ্ধতি ও কতক গুলি অপালনযোগ্য নীতিবাক্যেই ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পরিপূর্ণ। অন্ধ বিশ্বাসপরায়ণ না হইলে, কেহই তৎসমস্ত সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারে না! এই জন্য জ্ঞানিগণ জ্ঞানলাভের জন্য অন্যান্য বিজ্ঞানদর্শনাদি শাস্ত্র শিক্ষা করেন। কিন্তু যে সকল ব্যক্তি বিজ্ঞানদর্শনাদি শিক্ষা করিয়া জ্ঞানলাভ করে, তাহাদের ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্রের প্রতি কিছুমাত্র শ্রদ্ধা থাকে না।

আর এক দোষ এই যে, ঐ সকল ধর্ম্মশাস্ত্র পূর্ব্বে যেরূপ ছিল এখনও ঠিক সেইরূপই রহিয়াছে, কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই। কিন্তু মানবের অবস্থা নিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, কাহারও উন্নতি ও কাহারও অবনতি হইতেছে;

যে সকল জাতি পূর্ব্বে নিতান্ত অসভ্য ও মূর্খ ছিল, এক্ষণে তাহারা সভ্য ও জ্ঞানী হইয়াছে। সুতরাং যে সকল গ্রন্থ সেই অসভ্যগণের ধর্ম্মশাস্ত্র রূপে প্রচলিত ছিল, তাহা আধুনিক সভ্যগণের উপযোগী নহে। মানবের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মশাস্ত্রের উন্নতি হওয়া আবশ্যক। নচেৎ চিরকালই অসভ্য-গণের শাস্ত্রাবলম্বনে চলিলে, কোন কালেই মানবের উন্নতি হইতে পারে না। যদি অন্য উপায়ে কিছু উন্নতি সাধিত হয়,তবে সে উন্নত মানবগণ ঈশ্বরপরায়ণ হয় না। দুই সহস্র বৎসর পূর্ব্বে স্থাপিত খৃষ্টধর্ম্মশাস্ত্রে তদানীন্তন অসভ্য অবস্থার উপযোগী উপদেশ মাত্র আছে, সুতরাং উহা এখনকার কিছুমাত্র উপযোগী নহে; এই জন্য তদ্ধর্ম্মাবলম্বী পণ্ডিতগণ অন্তরের সহিত ঐ ধর্ম্ম-শাস্ত্রের আলোচনা করেন না; প্রত্যুত ধর্ম্মশাস্ত্রমতানুসারে চলিলে উন্নতির ব্যাঘাত হয় দেখিয়া, তাঁহারা ধর্ম্মানুসরণ সম্বন্ধে সকলকেই স্বাধীনতা দিয়া-ছেন। একান্ত অবলম্বনীয় ধর্ম্ম সখের জিনিষ হইয়াছে—রুচি অনুসারে গ্রহণীয় হইয়াছে। হিন্দুধর্ম্ম ভিন্ন পৃথিবীর সকল ধর্ম্মশাস্ত্রেরই ঐরূপ দশা। অন্য কোন ধর্ম্মশাস্ত্র কিছুমাত্র পরিবর্ত্তিত হয় নাই, সমস্তই সেই অসভ্য গণের জ্ঞাতব্য বিষয়ে পরিপূর্ণ। সুতরাং তৎসমস্ত মানবের অবলম্বনীয় ধর্ম্মশাস্ত্র নামের যোগ্য নহে। কিন্তু হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্রের প্রকৃতি সম্পূর্ণ অন্যরূপ। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র জ্ঞানের অনন্তভাণ্ডার। হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র আলোচনা করিলে পদার্থতত্ত্ব, আত্মতত্ত্ব, নীতিতত্ত্ব, সমাজতত্ত্ব, ঈশ্বরতত্ত্ব, কৃষি, শিল্প প্রভৃতি যাবতীয় প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষা করা যায়, এবং সকল প্রকার বিজ্ঞান-দর্শনে ও যুক্তি প্রদানে পটুতা লাভ করা যায়। হিন্দুশাস্ত্র চিরকালই আবশ্যক মত সংস্কৃত ও উন্নত হইয়া আসিতেছে সুতরাং উহা সকল সময় ও সকল অবস্থার উপযোগী। ভগবান্ মনু বলিতেছেন :—

অন্যে কৃতেযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ॥

ভগবান্ বাসুদেব বলিতেছেন :—

যদা যদা হি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্ম্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহং॥
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্।
ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

এই জন্য বেদের পর স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্র, উপনিষদ্ প্রভৃতি বহুতর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণীত হইয়াছে, তৎ সমস্তের ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভাষ্য ও টীকা প্রস্তুত হইয়াছে এবং বহুতর মীমাংসা ও সংগ্রহ গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। সেই সমস্ত আলোচনা করিলে সকল কালের ও সকল অবস্থার উপযোগী কর্ত্তব্য জ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। হিন্দুশাস্ত্রের কোন কথাই যুক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া জ্ঞানীর অবিশ্বাসের কারণ হয় না। সৃষ্টি ও ঈশ্বরের স্বরূপাদি সম্বন্ধেও উহার মত অন্যান্য শাস্ত্রের ন্যায় বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। সৃষ্টিসম্বন্ধে মনু বলিয়াছেন—

আসীদিদন্তমোভূতমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণং।
অপ্রতর্ক্যমবিজ্ঞেয়ং প্রসুপ্তমিব সর্ব্বতঃ॥
ততঃ স্বয়ম্ভূর্ভগবানব্যক্তো ব্যঞ্জয়ন্নিদং।
মহাভূতাদি বৃত্তৌজাঃ প্রাদুরাসীত্তমোনুদঃ॥

ভগবান্ বাসুদেব বলিতেছেন—

সহস্রযুগপর্য্যন্তমহর্যদ্ ব্রহ্মণো বিদুঃ।
রাত্রিং যুগসহস্রান্তাং তেঽহোরাত্রবিদোজনাঃ॥ ৬৯॥
অব্যক্তাদ্ব্যক্তয়ঃ সর্ব্বাঃ প্রভবন্ত্যহরাগমে।
রাত্র্যাগমে প্রলীয়ন্তে তত্রৈবাব্যক্তসংজ্ঞকে॥
ভূতগ্রামঃ স এবায়ং ভূত্বা ভূত্বা প্রলীয়তে।
রাত্র্যাগমেঽবশঃ পার্থ প্রভবত্যহরাগমে॥
পরস্তস্মাত্তু ভাবোঽন্যোঽব্যক্তোঽব্যক্তাৎ সনাতনঃ।
যঃ স সর্ব্বেষু ভূতেষু নশ্যৎসু ন বিনশ্যতি।
অব্যক্তোঽক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্॥

সৃষ্টির এই বিবরণ সম্পূর্ণ বিজ্ঞান সম্মত। ঈশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধীয় হিন্দুশাস্ত্রের মতও বিজ্ঞানবিরুদ্ধ নহে। কিন্তু অল্প আলোচনায় তাহা বুঝান যায় না, এই জন্য তদ্বিষয়ের কোনরূপ বিবরণ করা হইল না। ফলতঃ ভালরূপ আলোচনা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে, হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত জ্ঞানের পূর্ণ আধার। ইহার যত আলোচনা করিতে পারা যায়, ততই মানবের জ্ঞানোন্নতি হইতে থাকে। ধর্ম্মশাস্ত্রপাঠে কাব্য, দর্শন, বিজ্ঞান সমস্ত পাঠেরই ফললাভ হয়। যিনি বিধানানুসারে ধর্ম্মশাস্ত্র অভ্যাস করেন, তিনি

আত্মতত্ত্ব ও ঈশ্বরতত্ত্ব অবগত হইয়া ঈশ্বরাভিপ্রেত কার্য্য সম্পাদন করিয়া জীবনের চরিতার্থতা সম্পাদন করিতে পারেন। আর কোন উপায়েই মানব এরূপ জ্ঞানবান ও সুচরিত্র সম্পন্ন হইতে পারে না—আর কোন শাস্ত্র পাঠেই আত্মজ্ঞান ও ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অতএব হিন্দু ধর্ম্মশাস্ত্রই প্রকৃত ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র। সকলেরই ইহা অবলম্বনীয়। মানবের বন্যা-বস্থা হইতে সভ্যতার চূড়ান্ত সময় পর্য্যন্ত সকল প্রকার অবস্থার উপযোগী ব্যবস্থাই ইহাতে আছে। এই জন্য ইহার নাম সনাতন ধর্ম্ম।

অনেকে বলেন যখন হিন্দুশাস্ত্র গ্রন্থ বিশেষের নাম নহে, অসংখ্য গ্রন্থ হিন্দুশাস্ত্রের অন্তর্গত ও তৎসমস্তের মতের পরস্পর সামঞ্জস্য নাই, এমন কি একই গ্রন্থের মধ্যে পরস্পর বিপরীত মত দেখিতে পাওয়া যায়, তখন কোন মত প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্রের মত ও কোন গ্রন্থ প্রকৃত হিন্দুশাস্ত্র তাহা বুঝিব কি প্রকারে? ইহার উত্তর দেওয়া বড় সহজ নহে। কারণ শাস্ত্রে প্রকৃত জ্ঞান না জন্মিলে, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট নিয়মে হিন্দুশাস্ত্র অধ্যয়ন ও তাহার অনুশীলন করিলে আপনা হইতেই ইহার সদুত্তর লাভ করিতে পারা যায়। বাস্তবিক হিন্দুর ধর্ম্মশাস্ত্রের মধ্যে কোন স্থানেই অসামঞ্জস্য নাই। অজ্ঞান চক্ষে যে সকল অসামঞ্জস্য লক্ষিত হয়, জ্ঞানলাভ হইলে আর সে অসামঞ্জস্য বোধ হয় না। দেশ, কাল পাত্র ও অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার কার্য্য কর্ত্তব্য এই কথা বুঝাইবার জন্য শাস্ত্রে কতকগুলি পরস্পর বিপরীত ভাবাপন্ন কর্ত্তব্য বিধি, ভিন্ন ভিন্ন নানা প্রকার দেব দেবীর মূর্ত্তি ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার উপাসনাপদ্ধতি আছে। সেই গুলি দেখিয়াই আধুনিক পণ্ডিতগণ হিন্দুশাস্ত্রকে অসামঞ্জস্যময় বলেন। কিন্তু বাস্তবিক সেগুলি অসামঞ্জস্য নহে; ঐ ভিন্নতা আছে বলিয়াই হিন্দু-ধর্ম্মশাস্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে ও সেই জন্যই উহা মানবের সনাতন ধর্ম্ম নামে অভিহিত হইবার উপযোগী হইয়াছে। আমরা পূর্ব্বেই একথা একরূপ সপ্রমাণ করিয়াছি। ভগবান্ বাসুদেব বলিয়াছেন—

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
মম বর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

এ সকলের আলোচনা করিতে হইলে বৃহৎ একখানি গ্রন্থে সম্পূর্ণ হয় না। সুতরাং তাহার আলোচনায় ক্ষান্ত হইতে হইল। স্বতন্ত্র গ্রন্থে এ সক-

লের আলোচনা করিবার ইচ্ছা রহিল। উপযুক্ত গুরুর নিকট সুনিয়মে শিক্ষা করিলে সমস্ত জানিতে পারা যায়।

কেহ কেহ হয় ত বলিবেন, যে, পরমেশ্বর যখন সকল মানবের জন্যই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রণয়ন করিয়াছেন, তখন কেন তিনি একখানি স্বতন্ত্র ধর্ম্মপুস্তক প্রণয়ন করিয়া সকলের সুপ্রাপ্য করিয়া দিলেন না? তাহা হইলে আমরা অনায়াসে সেই গ্রন্থ পাঠ করিয়া কর্ত্তব্য সকল অবগত হইয়া, তদনুরূপ কার্য্য করিতে পারিতাম, কোন গ্রন্থখানি প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র ও কোন ব্যবস্থা কিরূপ লোকের উপযোগী, তাহা জানিবার জন্য কোন কষ্ট পাইতে হইত না; সকল লোকেই এক বাক্যে সংশয় শূন্য হইয়া তদনুসারে চলিতে পারিত। কেবল জ্ঞানিগণ ধর্ম্মভূষণে ভূষিত না হইয়া সকলেই ধার্ম্মিক হইতে পারিত। আমাদের বোধ হয় একটু বিবেচনা করিলেই এ রহস্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারা যায়। কেন না ঐরূপ গ্রন্থ বিশেষ মানবের জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে, সকল মানব বা শ্রেণী বিশেষের সকল মানব শ্রেণী বিশেষের ইতর প্রাণীর ন্যায় চিরকাল একই প্রকার কার্য্য করিত। কিন্তু ঈশ্বরের অভিপ্রায় ত সেরূপ নহে। যদি সেরূপ অভিপ্রায় তাঁহার থাকিত, অর্থাৎ ইতর প্রাণীর ন্যায় যদি সকল মনুষ্যকে সকল অবস্থায় একরূপ কার্য্য করান তাঁহার অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তিনি ইতর প্রাণীর ন্যায় মানবের হৃদয়েও প্রাকৃতিকশক্তিবিশেষ(Instinct)দিয়া সেইরূপ করাইতে পারিতেন। ধর্ম্মশাস্ত্র করার কোন প্রয়োজনই ছিল না। অতএব যে উদ্দেশ্য সাধন জন্য তিনি মানবহৃদয়ে Instinct দেন নাই, সেই উদ্দেশ্য সাধন জন্যই নির্দ্দিষ্ট ধর্ম্মশাস্ত্র প্রদান করেন নাই। ধর্ম্মশাস্ত্র উক্তরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলে তাঁহার সে উদ্দেশ্য সাধিত হইত না। যতদূর আলোচনা করা হইয়াছে তাহাতে বুঝা গিয়াছে, যে পরমেশ্বর মানবকে জ্ঞানেরই অধীন করিয়াছেন। জ্ঞানালোচনা করিয়াই মানবের কর্ত্তব্য নির্ণয় করিতে হইবে—জ্ঞানানুশীলন করিয়াই ঈশ্বর ও ধর্ম্মতত্ত্ব অবগত হইতে হইবে। শিক্ষা প্রভাবে মানব দিন দিন নূতন তত্ত্ব অবগত হইয়া নব নব আনন্দ লাভ করিতে থাকে। কিন্তু এক অবস্থায় থাকিলে সে আনন্দ লাভ করা যায় না, জ্ঞানালোচনারও আবশ্যকতা হয় না।

এক্ষণে অনেকের মনে এই সন্দেহ উপস্থিত হইতে পারে যে, যদি হিন্দু-শাস্ত্রই একমাত্র ধর্ম্মশাস্ত্র, তবে উহা সকল দেশে প্রচারিত নহে কেন?

অন্যান্য দেশের লোকের কি ধর্ম্মাচরণ আবশ্যক নয়? যদি আবশ্যক না হয় তবে কি প্রকারে তাহারা কর্ত্তব্য পরায়ণ হইবে? এ সন্দেহ নিরাকরণ জন্য অধিক বাগাড়ম্বরের প্রয়োজন নাই। পূর্ব্বে যে সকল বিষয়ের আলোচনা করা গিয়াছে, সেই গুলির প্রতি মনোনিবেশ করিয়া চিন্তা করিলেই এ সন্দেহ অনায়াসে নিরাকৃত হইতে পারে। বাস্তবিক পরমেশ্বর কেবল ভারতবর্ষেই ধর্ম্ম প্রচার করেন নাই, তিনি সকল দেশেই ধর্ম্মশাস্ত্র দান করিয়াছেন। প্রাচীন কালের উপযোগী ধর্ম্মশাস্ত্র সকল দেশেই আছে। বালকের শিক্ষা পুস্তকে যেমন কেবল সাধারণ সূত্র মাত্র থাকে, সেইরূপ সকল দেশের ধর্ম্মশাস্ত্রেই সাধারণের উপযোগী সাধারণ ধর্ম্ম সূত্র গুলি আছে। বিশেষ সূত্র জ্ঞানসাপেক্ষ—উন্নতিসাপেক্ষ। ভারতবাসিগণ নিয়ত ধর্ম্ম চর্চ্চা করিয়াছেন বলিয়া হিন্দুশাস্ত্র পূর্ণতা প্রাপ্ত হইয়াছে, অন্যান্য জাতীয়গণ সেরূপ ধর্ম্ম চর্চ্চা করেন নাই, তাই তাঁহাদের ধর্ম্মশাস্ত্র অপূর্ণ রহিয়াছে। কিন্তু অনেক অনেক জাতি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্র শিক্ষা করিয়া আপন আপন ধর্ম্মশাস্ত্র সংস্কৃত করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। বৌদ্ধ, খৃষ্ট প্রভৃতি ধর্ম্মশাস্ত্র হিন্দুধর্ম্মের অংশবিশেষ অবলম্বনে সঙ্কলিত। ক্রমে যতই মানব উন্নতি লাভ করিবে, ততই ইহার অন্যান্য অংশও সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবে। হিন্দু ভিন্ন পৃথিবীর আর কোন জাতিই অদ্যাপি প্রকৃত মানব পদ-বাচ্য হয় নাই। অন্যান্য জাতির যে উন্নতি দেখা যাইতেছে, সে প্রকৃতি উন্নতি নহে। শিল্পাদিবিষয়ে অনেকে যথেষ্ট উন্নতি করিয়াছেন বটে, কিন্তু প্রকৃত মানবত্বের উন্নতি কেহই করিতে পারেন নাই। আধুনিক সভ্যগণ রজোগুণ সম্পন্ন, হিন্দু ভিন্ন আর কোন জাতিই সত্ত্বগুণ সম্পন্ন হইতে পারে নাই। এক্ষণে হিন্দু জাতিও স্বগুণ হারাইয়াছেন। তাই তাঁহারা সত্ত্বগুণময় স্বধর্ম্ম অবলম্বনে চলিতে সমর্থ নহেন, তাই তাঁহাদের দ্বারা হিন্দুধর্ম্মের ভয়ানক দুরবস্থা ঘটিয়াছে। এক্ষণে যাহা হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত তাহা প্রকৃত হিন্দুধর্ম্ম নহে। উহা হিন্দুধর্ম্মের প্রাণশূন্য গলিত দেহ মাত্র। কতকগুলি উদ্দেশ্যশূন্য বাহ্য আচারসমষ্টিই এক্ষণে হিন্দুধর্ম্ম নামে পরিচিত। তাই স্বদেশে বিদেশে উহার এত অনাদর।

সম্পূর্ণ।

ধর্ম্মবিজ্ঞান।

শ্রীবীরেশ্বর পাঁড়ে

প্রণীত।

২৫ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট

পাঁড়ে ব্রাদার্স আর্য্য-পুস্তকালয় হইতে

প্রকাশিত।

কলিকাতা

২ নং নবাবদি ওস্তাগরের লেন,

ইংরাজি সংস্কৃত যন্ত্রে

শ্রীপীতাম্বর বন্দ্যোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

সন ১২৯৭

বিজ্ঞাপন।

আজি কালি ধর্ম্মের প্রতি কাহারই কিছুমাত্র আস্থা দেখিতে পাওয়া যায় না। ধর্ম্ম সখের জিনিস হইয়া পড়িয়াছে। রুচি অনুসারে যেমন লোকে ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বস্ত্রালঙ্কার পরিধান ও ভিন্ন ভিন্ন প্রকার ভোজ্য ভোজন করে, ধর্ম্মও সেইরূপে রুচি অনুসারে গ্রহণীয় হইয়াছে। যে ধর্ম্মশাস্ত্র যাহার ভাল বলিয়া বোধ হয়, তাহারই অবলম্বনে চলিলে কর্ত্তব্য সম্পাদন করা হয়, ইহাই এক্ষণে সাধারণের বিশ্বাস। তাহা সহস্র মিথ্যাদোষে দূষিত হইলেও কোন প্রকার অনিষ্টকর বলিয়া বিবেচিত হয় না। অধিক কি বিশ্বাসানুসারে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের সত্তা অস্বীকার করিলেও এক্ষণকার সমাজে দোষ বলিয়া পরিগণিত হয় না। প্রত্যুত নাস্তিকগণই এক্ষণে অধিক পণ্ডিত বলিয়া সাধারণের নিকট আদৃত হয়েন। অযথা বিজ্ঞানপরায়ণতাই ইহার প্রধান কারণ। পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করিয়া লোকে বুঝিয়াছে, যে, যে বিষয় বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা প্রতিপন্ন না হয় তাহা সত্য নহে। কিন্তু যুক্তি কাহাকে বলে, বিজ্ঞান কাহাকে বলে তাহা কেহ বুঝিতে পারেন নাই। একমাত্র পদার্থ বিজ্ঞানকে বিজ্ঞান এবং পাশ্চাত্য শিক্ষার অনুকূল যুক্তিকেই যুক্তি বলিয়া জানিয়াছেন সেই বিজ্ঞান ও সেই যুক্তি অবলম্বনে ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের স্বরূপ সপ্রমাণ করিতে পারা যায় না দেখিয়া ধর্ম্ম ও ঈশ্বরকে যুক্তি ও বিজ্ঞান বিরুদ্ধ বিবেচনা করেন। তাই আধুনিক অতিপণ্ডিতগণ প্রায়ই নাস্তিক। কিন্তু বিশ্বাস কোন প্রকার যুক্তি বা বিজ্ঞানের কথা শুনিতে চায় না, সেই জন্য অনেকের মত এই যে, ধর্ম্ম ও ঈশ্বর বিজ্ঞানের অবিষয়; উহা সহজাত বিশ্বাস অনুসারে অবলম্বনীয়। তাই বিশ্বাস যে ধর্ম্মকে সত্য বলে তদবলম্বনে চলা তাঁহার উচিত বিবেচনা করেন। কিন্তু বাস্তবিক বিশ্বাস সহজাত নহে, শিক্ষা উহার জনক। (মানবতত্ত্ব দেখিতে অনুরোধ করি)। এক্ষণে সকলেই বাল্য কাল হইতে পাশ্চাত্য শিক্ষাপরায়ণ, সুতরাং তদনুরূপ বিশ্বাসের বশীভূত হইয়াই সকলে ধর্ম্ম নির্ব্বাচন করেন। যাঁহার যেমন শিক্ষা ও যেমন রুচি সেইরূপ কার্য্য করাকে তিনি কর্ত্তব্য ও ধর্ম্ম বিবেচনা করেন। সুতরাং একই প্রকার কার্য্য একজনের মতে কর্ত্তব্য ও আর এক জনের মতে অকর্ত্তব্য। কিন্তু বাস্তবিক ধর্ম্ম এক ভিন্ন দুই প্রকার নহে। অতএব

বিশ্বাসরূপ ধর্ম্ম অবলম্বন করিলে প্রকৃত ধর্ম্ম পরায়ণ হওয়া যায় না। 'ধর্ম্ম ও কর্ত্তব্য করিতেছি' নিজে ইহা মনে করিলেই ধর্ম্ম করা হয় না—অন্যায় করিয়া ন্যায় করিতেছি ভাবিলে ন্যায় করা হয় না। প্রকৃত ধর্ম্মানুষ্ঠান আবশ্যক।

ধর্ম্ম আমাদের একমাত্র পরম বন্ধু। ধর্ম্মহীন হইলে মনুষ্যত্বই থাকে না। যিনি ধর্ম্মপথে বিচরণ করেন না, তাঁহার অন্য সকল প্রকার উন্নতিই বিফল। আমাদের যত দুঃখ সমস্তই ধর্ম্মহীনতা জন্য। অতএব যদি আমাদের প্রকৃত হিত ও উন্নতি সাধন আবশ্যক হয়, তবে ধর্ম্মেরই উন্নতি করিতে হইবে। (ধর্ম্মের উন্নতি হইলে আবশ্যক সকল বিষয়েরই উন্নতি হয়। ধর্ম্মের উন্নতি না হইলে কোন বিষয়েরই উন্নতি হয় না।) এই কথা বুঝানই এই ধর্ম্মবিজ্ঞান প্রণয়নের মুখ্য উদ্দেশ্য। বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা সপ্রমাণ না করিলে এক্ষণকার বিজ্ঞানপরায়ণগণ কোন কথাই শুনিতে চাহেন না, এই জন্য বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা ধর্ম্ম ও ঈশ্বরের বিষয় সমপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করা হইয়াছে। সে চেষ্টা কতদূর সফল হইয়াছে, তাহা সহৃদয় পাঠকগণ বিবেচনা করিবেন।

বৎসরাবধি আমার শরীর অত্যন্ত অসুস্থ এবং নানা কারণে এক্ষণে মনও স্থির নহে, এজন্য আমি এরূপ পুস্তক প্রণয়নে যেরূপ পরিশ্রম করা আবশ্যক তাহা করিতে পারি নাই। পাছে পুস্তক খানি অসমাপ্ত থাকে, এই ভয়ে কোন প্রকারে পুস্তক খানি বাহির করিলাম। ত্রুটী মার্জ্জনা করিলে বাধিত হইব। ইহার অনেকগুলি প্রবন্ধ প্রতিমা ও অনুসন্ধানে প্রকাশিত হইয়াছিল। সে সকল প্রবন্ধ অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।

কলিকাতা
১২ পৌষ ১২৯৭ } শ্রীবীরেশ্বর শর্ম্মা।